৭। আইহোল

সকাল সাতটার বাসে আইহোল যাত্রা করলাম। ভাড়া সাড়ে বার টাকা। পাট্টাডাকাল থেকে আইহোল সতেরো কিলোমিটার। বাদামী ফিরে যেতে হবে একই পথে। মোট ৪৬ কিলোমিটার পথ। বাস পৌঁছে দিল ন'টা নাগাদ।

শুনেছি পথে পড়ে কৃষ(া-মালপ্রভা-ঘাটপ্রভা নদীর সঙ্গম — কুদালা সঙ্গম। সাধক বাসবেশ্বরের বাস ছিল এখানে। সাধনায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে দর্শন দেন। নদীর মাঝে সুড়ঙ্গের মতো মন্দির আছে।

বাসে বসে আরো জানা গেল যে এই বাসটাই এক ঘন্টা পরে ফিরে যাবে বাদামী। পরের বাস বিকেল চারটেয়। সুতরাং আমাদের ফিরতি বাসটাই ধরতে হবে। হাতে তাহলে মোটে এক ঘন্টা সময় পাচ্ছি। এর মধ্যে আইহোল দেখা শেষ করতে হবে। দেখা যায়?

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত চালুক্যদের রাজধানী ছিল আইহোল। আইহোলি বা আইভোলে নামেও পরিচিত। প্রাচীন নাম আর্যপুর। আর্যরা প্রথম এখানে আস্তানা গেড়েছিল নাকি! পরশুরামের কুঠার (ত্রিয় নিধনের পরে এখানে এসে ধৌত হয়। তিনি নাকি বলে উঠেছিলেন 'আয়ো হোলে'। তা থেকে আউহোলে। বর্তমানে বাগলকোট জেলার অন্তর্গত। অদূরে মালপ্রভা নদী।

শতাধিক মন্দির আছে এখানে। বোধ হয় সংখ্যাটা একশ' পঁচিশের মতো হবে। বাইশটি এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে সেসব। ব্রহ্মা-বিষু(-মহেশ্বরের মন্দিরই প্রধান। কিছু জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরও আছে। মোটামুটিভাবে ৪৫০ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাবে এখানে। তাহলে তো জায়গাটিকে ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য রীতির অন্যতম সূতিকাগার বলা চলে। ভারতীকে বললাম — আইহোলে আমরা এক ঝটকায় প্রায় ১৫৫৩ বছর অতীতে চলে যাব?

— তার মানে পাট্টাডাকালের থেকে আরো প্রাচীন কালে।

বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে ডানদিকে ঘুরে চলে গেল। যেখানে নামিয়ে দিল তার বাঁ পাশেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংর(ত এলাকা। প্রবেশমুখের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে — এখানে মন্দির নির্মাণ শৈলীর প্রথম পর্বে প্যাভিলিয়নের মতো একচালার ঢালু আচ্ছাদন দেওয়া মন্দির নির্মিত হয়েছে। যেমন — লাডখান, গৌড়ভি, কুন্তি, হুচ্চাপ্পায়া এবং মেগুথি মন্দির। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রকার নির্মাণ-কৌশলই প্রচলিত ছিল। কালত্র(মে নির্মাণশৈলী পরিণতি লাভ করে। এরপর প্রধান তিন প্রকার নির্মাণশৈলী করায়ত্ত

হয় — দ্রাবিড়, নাগর এবং কদম্ব-নাগর রীতি। প্রথমটিতে অষ্টভুজ গম্বুজের মতো শিখর-শীর্ষ ব্যবহৃত হয়েছে। তার নমুনা দেখেছি মল্লিকার্জুন ও গলগনাথ মন্দিরে। নাগর রীতি অনুসৃত হয়েছে হুচিমাল্লি এবং চত্র(গুডি মন্দিরে। কদম্ব-নাগর রীতিতে ধাপে ধাপে পিরামিডের মতো বিমান নির্মিত হয়েছে।

টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই নজর কাঁড়ল এক অদ্ভুত রকমের স্থাপত্য। এটি না মন্দিরের মতো, না প্রাসাদের মতো। ভারতে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে এই চত্র(াকার স্থাপত্যটি। নাম দুর্গাগুডি। না, এটি দেবী দুর্গার মন্দির নয়। বিষু(র মন্দির। অতীতে কোন এক সময় দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বোধ হয় মারাঠাদের সময়ে। সেই হিসেবে এর নাম হওয়া উচিত ছিল দুর্গমন্দির। লোকমুখে হয়ে গেল দুর্গামন্দির।

চিত্র-৫৪। দুর্গামন্দির, আইহোল।

সমতল-ছাদ বিশিষ্ট নাম-না-জানা এক ভগ্নমন্দির এড়িয়ে আমরা দুর্গাগুডির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা দিল্লির পার্লামেন্ট হাউসের মতো। পশ্চিম দিকে গজপৃষ্ঠের মতো গোলাকার অলিন্দ। উত্তর-দ(ণে সমান্তরাল গঠন। প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে। সার সার চারকোণা ভারী স্তম্ভ দিয়ে সাজানো চারদিকের অলিন্দ। মন্দিরের সামনের দিকের স্তম্ভসারির কিছু অংশে ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে। অধিকাংশ যুগলমূর্তির রিলিফ।

চিত্র-৫৫। দুর্গামন্দির, আইহোল।

পূর্বমুখী মন্দির বলে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি পূবদিকে। কিন্তু একটু অন্য রকমের সিঁড়ি। উত্তর-দ(ণ দুপাশ থেকে কয়েক ধাপে উঠে গিয়েছে প্রথম ফ্লাইট। তারপর ছোট্ট চাতাল। চাতাল থেকে পশ্চিমে উঠেছে দ্বিতীয় ফ্লাইট। সিঁড়ির দুটি ফ্লাইটেই রেলিং আছে। মন্দিরের উপপীঠ মোল্ডিংয়ের কাজে সমৃদ্ধ।

চিত্র-৫৬। দুর্গামন্দির, আইহোল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লাম চারদিক খোলা অগ্রমণ্ডপে। কোমর সমান উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। ক(াসনে জোড়া প্রান্তদেশের স্তম্ভসকল। চারটি স্তম্ভ শোভা পাচ্ছে অগ্রমণ্ডপের সামনের লাইনে। দু'সারিতে আটটি স্তম্ভ ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। তারপর দেয়াল-ঘেরা অন্তরাল-মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের পিছনের দিকও গজপৃষ্ঠের মতো অর্ধগোলাকার। গর্ভগৃহ-অন্তরাল বেষ্টন করে উপপীঠের উপর নির্মিত হয়েছে প্রদ(ণপথ। চতুষ্কোণ ভারী স্তম্ভসারি দিয়ে সাজানো — দূর থেকে সেটাই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগেই বলেছি অনেকটা পার্লামেন্ট হাউসের মতো মনে হয়।

চিত্র-৫৭। দুর্গামন্দির, আইহোল।

অন্তরাল-মণ্ডপের মাঝামাঝি জায়গায় লম্বালম্বি দু'সারিতে আটটি স্তম্ভ রয়েছে। ফলে মণ্ডপটি তিনটি লেনে বিভক্ত(হয়ে পড়েছে। মধ্যবর্তী লেন ধরে গর্ভগৃহের দিকে এগিয়ে গেলাম। শূন্য বিগ্রহবেদী। ছাদ সমতল হলেও মাঝের লেনের ছাদ সবথেকে বেশি উঁচুতে। আর দুপাশের ছাদ আরেকটু নিচে। তারপর সমতল ছাদ ঘিরে রয়েছে ঢালু চালা-ছাদ — মন্দিরের প্রদ(ণ-পথের উপরে। এরকম ছাদের গঠন আইহোল মন্দিররাজির বিশেষত্ব। বুঝিয়ে দেয় মন্দির নির্মাণশৈলীটি যথেষ্ট প্রাচীন। গর্ভগৃহের উপরদিকে সমতল ছাদ ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠে গিয়েছে গোপুরমের মতো বর্গাকৃতি ত্রিরথ শিখর। তার খানিকটা দৃশ্যমন। উপরাংশ ভগ্ন। এরকম মন্দির-শিখরও সহসা নজরে পড়ে না। ভারতী বলল — দেখতে অনেকটা জাহাজের চিমনির মতো লাগছে।

চিত্র-৫৮। দুর্গামন্দির।

দুর্গামন্দিরের অর্ধবৃত্তাকার অলিন্দ (অ্যাপসে) এবং গর্ভগৃহ-মণ্ডপ বেষ্টন করে থাকা কা(কার্যময় গ্যালারি বিশেষভাবে খ্যাত হয়ে আছে বিদগ্ধ মহলে। গ্যালাবির এগারোটি দেবকোষ্ঠ সমৃদ্ধ হয়েছে অনুপম ভাস্কর্যে। প্যানেলে মূর্ত রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। আছে অর্ধমানব অর্ধসিংহ রূপে খ্যাত নৃসিংহদেব। আছেন শিব ও বিষু(র সমাহারে কল্পিত হরিহর ও অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।

চিত্র-৫৯। ভূবরাহ।

চিত্র-৬০। হরিহর।

অতি প্রসিদ্ধ এখানকার মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি। কালের অনিবার্য প্রকোপে ভগ্নদশা প্রকট। তবু বীরত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তি(দেবীত্বে এবং সৌকর্যে অনবদ্য। দেবী চামুণ্ডা মহিষরূপী অসুরকে এক পায়ে পদদলিত করছেন। ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধও করছেন মনে হল। দেবীর বাহন সিংহ রয়েছে ডানপাশে। সিংহটি অপটু হাতের নির্মাণ বলে মনে হলেও ভারী সুন্দর গড়ন দেবীমূর্তিটির। দুজনে অনেকটা সময় দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলুম।

দেবীর রূপরাশি ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গে। আননে উৎফুল্ল কৌতুক। দীর্ঘাঙ্গিনী ৈণকটি দেবীকে এখানে অষ্টভুজা বলে মনে হচ্ছে। তবে মাত্র চারখানি হাত অ(ত। চক্র(, শঙ্খ, শূল, অসি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত। মস্তকে দীর্ঘ মুকুট শোভা পাচ্ছে। পিছনে চক্রে(র মতো কিছু একটা রয়েছে, ওটা বাগান-নামক অলঙ্কার না প্রভাবলী বুঝে উঠতে পারলাম না। কর্ণভূষণ কাঁধের উপর নেমে এসেছে। কণ্ঠে সীতাহার। উন্নত স্তনদ্বয়ের মাঝ দিয়ে একসুতোয় দোদুল্যমান চৌকো লকেট, আর তা থেকে দুটো অলঙ্কারসূত্র কটিতটের দুপাশে। বাজুতে তিন-পাকে জড়ানো বাজুবন্ধ। মণিবন্ধে

চিত্র-৬১। মহিষাসুরমর্দিনী, আইহোল।

যুদ্ধাস্ত্র মণিত্রাণ রয়েছে। অঙ্গে উত্তরীয়ের মতো অলঙ্কার দু'কাঁধের উপর থেকে কোমড়ের নিচ পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। কটিতে বসন, কটিবন্ধ-গোট দ্বারা সজ্জিত। গুলফদেশে মল ও চরণে নূপুর। খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। তেরোশ' বছরের প্রাচীন দেবীর স্নিগ্ধ মহিমায় বিভোর হয়ে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন বৌদ্ধচৈত্য ও মহাবলীপুরম রথের সমন্বয়ে গড়া অষ্টম শতকের প্রথম কোয়ার্টারে নির্মিত হয়েছে এই বিষু(মন্দির। দ(ি ণ-পূর্ব দিকে গোপুরমের যে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সেখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি শিলালিপি। তা থেকে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিত্র(মাদিত্যর নাম জানা যাচ্ছে। শাসনকাল ছিল ৭৩৩ থেকে ৭৪৪ খৃষ্টাব্দ। সেজন্যে মন্দিরের নির্মাণকাল অষ্টম শতকের প্রথম দিকে বলেই অনুমান। নির্মাতা হিসেবে কোন এক কোমরসিংহের নামও জানা যাচ্ছে।

দুর্গামন্দিরের দ(ি ণ-পাশ্চিম দিকে একাধিক মন্দির নজরে আসে। প্রথম মন্দিরটির শিখরচূড়া রয়েছে। সময়াভাবের জন্য সেটা আমরা দেখিনি।

পরবর্তী মন্দিরটির উন্মুক্ত(স্তম্ভের কা(কৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। (চিত্রে দু'পাশে দু'টি দেয়াল-ঘেরা ক(- গর্ভগৃহ এবং সামনে অগ্রমণ্ডপ। মাঝখানের রঙ্গ মণ্ডপ বড়ো। মধ্যিখানে চারটি সুদৃশ্য গোলাকার স্তম্ভ রয়েছে। কা(কার্যময়। তলদেশে চৌকো পীঠ। খানিকটা ছাদ নেই বলেই দু'টি স্তম্ভ বাইরে থেকে দেখা

চিত্র-৬২। দুর্গামন্দির থেকে আইহোল।

চিত্র-৬৩। সূর্যনারায়ণ মন্দির।

যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে স্তম্ভের অলঙ্করণে লেদযন্ত্রের মতো কোন যন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। পশ্চিমদিকের গর্ভগৃহের উপর শিখর রয়েছে – প্রথম ধাপ বর্গাকার, তার উপর প্রায় গোলাকার শীর্ষদেশ। বর্তমানে ভাঙাচোরা। মণ্ডপ-অগ্রমণ্ডপ ঘিরে ঢালু চালাছাদ। এটি সূর্যনারায়ণ মন্দির কিনা আমরা নিশ্চিত নই। হয়তো সূর্যদেবতার সঙ্গে অর্চিত হচ্ছে ঊষা ও সন্ধ্যা। সপ্তম কি অষ্টম শতকের নির্মাণ।

এর দ(ি ণে-পাশ্চিমে লাডখান মন্দির। দ(ি ণভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শন লাডখান মন্দির। বলা হয়, এটি দ্রাবিড়ীয় চালুক্য রীতিতে গড়া। পরিকল্পনায় উত্তরভারতের গুপ্তযুগের নির্মাণ শৈলীর ছাপও আছে নাকি। সেসব আমরা অবশ্য বুঝলাম না। বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কাউকে পেলে হয়তো ভালো হত। মন্দিরটি সপ্তম শতকের প্রথমদিকে নির্মিত

চিত্র-৬৪। লাডখান মন্দির, আইহোল।

চিত্র-৬৫। লাডখান মন্দির, আইহোল।

হয়েছে। লাডখানকে বলা হয় প্যাভিলিয়ন ধরণের মন্দির। অনেকটা গ্রামগঞ্জের পঞ্চায়েতধর্মী সভাঘরের মতো। গড়ন বর্গাকার। হলঘরের বাইরের দেয়াল তৈরী হয়েছে লম্বা লম্বা পাথরের স্ল্যাব দিয়ে। কাঠের বাড়ি বানানোর মতো করে। তিনদিক পাথরের ফলক দিয়ে ঘেরা। মোল্ডিং-করা অধিষ্ঠানের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অলঙ্করণে কলসের ব্যবহার হয়েছে খুব। পূর্বদিকে মন্দিরের প্রবেশদ্বার – পাঁচ-ছটি ধাপ উঠে খোলা মুখমণ্ডপে পা রাখতে হবে। সিঁড়ির দু'ধারে মোল্ডেড রেলিং। তার দুপাশে তিনখণ্ড পাথর দণ্ডায়মান। মুখমণ্ডপটি আয়তাকার, মূল সভাঘর থেকে দৈর্ঘ্যে ছোট। সামনের দিকে চারটে করে মোটা ভারী চৌকো স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভে নানা মূর্তি শোভা পাচ্ছে। সিঁড়ির দু'পাশে যুগল মিথুনমূর্তি এবং দু'ধারে ত্রিভঙ্গ নারীমূর্তি। একেবারে দ(ি ণের থামে কচ্ছপের উপর দণ্ডায়মান দেবী কি যমুনা? তবে তো উত্তরের থামে গঙ্গাদেবী থাকার সম্ভাবনা। মূর্তি ভীষণভাবে (য়ে গিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না। মুখমণ্ডপের রেলিংও অলঙ্কৃত। তিন সারিতে মোট বারটি স্তম্ভ মুখমণ্ডপের চালাছাদ বহন করছে, তিন ধাপওয়ালা

চিত্র-৬৬। ভাস্কর্য, লাডখান মন্দির, আইহোল।

চালাছাদের নিম্নতম ধাপে। ঢালু ছাদ অনেকটা টালির মতো করে বসানো হয়েছে। কয়েক সারি স্তম্ভের উপর ভর করে রয়েছে ভিতরের সুপ্রশস্ত সভাঘর। হলের কেন্দ্রীয় ভাগে রয়েছে চার স্তম্ভের উপর নির্মিত এক টুকরো চৌকো মণ্ডপ। সেখানে নন্দীর আসন অধিষ্ঠিত। তাকে বেষ্টন করে রয়েছে প্রথমে বারোটি স্তম্ভের এবং তারপর কুড়িটি স্তম্ভের সারি। সব মিলিয়ে বেশ বড়ো চতুষ্কোণ হলঘর। একেবারে পিছনে গর্ভগৃহ।

বললাম — ল(্য করে দেখ, ঠিক মাঝখানের চারটে স্তম্ভের মাথায় বসেছে সমতল ছাদ। সবথেকে উঁচুতে। এখানেই নন্দীর আসন।

চিত্র-৬৭। ভাস্কর্য লাডখান মন্দির।

— মাঝের পিলার চারটি চওড়ায় প্রায় আড়াই ফুট হবে। উচ্চতায় সাড়ে ন' ফুট। ত্র(মশ খাটো স্তম্ভের সারির উপর রয়েছে দু-থাকে পাথরের চালা-ছাদ। একেবারে পশ্চিমদিকের মাঝামাঝি গর্ভগৃহ। এর ছাদও ঢালু চালা ধরণের। এখানে দ্বারের উপর গ(ড় আছে। দুপাশে মুদগর হাতে দ্বারপাল।

— অদ্ভুত গড়ন। তাই না?

হলঘরের উপরকার সমতল ছাদের উপরে চিলেকোঠার মতো একখানি ঘর দেখা যাচ্ছে। সেখানে আরেক বিগ্রহাসন রয়েছে। অনুচ্চ ছোট ত্রিরথ আকারের ঘর। তিনদিকে তিনটি মূর্তি আছে। দ(িণে শঙ্খ-চত্র(-মাল্য হস্তে বিষু(এবং পশ্চিমে সূর্য। বিগ্রহাসনে কি সূর্যমূর্তি ছিল? সম্ভবত ছিল। উদিত সূর্যের কিরণ যেন সূর্যদেবতাকে স্পর্শ করে আকাশচারী হত।

দুর্গামন্দির যেমন অনন্য, তেমনি লাডখান মন্দিরের গঠনও সচরাচর দেখা যায় না। মন্দির স্থাপত্যে যেন তখনো কোন দিশা মেলেনি, চেষ্টা চলছে। পরবর্তী কালেই বোধ হয় মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত হয়েছেন শিব।

কিন্তু নামটা লাডখান কেন? জানা গেল, উনবিংশ শতকে লাডখান নামের এক মুসলমান শাসক কিছুকাল বাস করেছিলেন এই মন্দিরে। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয়ে গিয়েছে লাডখান। তখনই নাকি দেয়ালের সূর্য-বিষু(-শিব মূর্তিগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল। র(া পেয়েছে যৎসামান্য কিছু। দেয়ালে শিলালিপি রয়েছে। বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি(পঞ্চশতক (অর্থাৎ আর্যপুরার চতুর্বেদী) সঙঘকে দান করেছে।

আশেপাশে আরো একগুচ্ছ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। দ(িণ দিকে দুটি

মন্দিরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজকর্ম হচ্ছে। জায়গাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই।

চিত্র-৬৮। গৌড়ার গুড়ি, আইহোল।

দ(িণ-পূর্বে একটু নিচুতে আরো একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। সামনে চারটি করে এবং পাশে ছয়টি করে থাম। সবশুদ্ধ প্রান্তদেশে ষোলোটি থাম হবে। মধ্যিখানে চারটি স্তম্ভের উপর সমতল ও উঁচু ছাদ। চারপাশে চালা-ছাদ। সম্ভবত এ টি গৌড়র গুডি যার গঠন অনেকটা লাডখানের মতো। নির্মাণ হয়েছে হয়তো আরো আগে - ৫ম শতকে। উপাস্য দেবী ভগবতী বা মহালক্ষ্মী। তখন নগরের নামও ছিল নাকি ভগবতী কোল্লা।

চিত্র-৬৯। আইহোল মন্দির চত্বর।

উত্তরপূর্বে আরেকটি মন্দির দেখছি একই রকমের চালাছাদের। এই সমস্ত মন্দিরের সঠিক পরিচয় জানার মতো সময় আমাদের হাতে ছিল না। তবে এদের মধ্যে একটি মন্দির চত্র(গুডি মন্দির। ৯ম শতকের নির্মাণ। গর্ভগৃহের উপরে নাগরশিখর আছে আর আছে আমলক যা দূর থেকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিত্র-৭০। চত্র(গুড়ি মন্দির।

দুর্গামন্দিরের পুবদিকে আইহোলের মিউজিয়াম। শুত্র(বার ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদে দশটা-পাঁচটা খোলা। হাতে সামান্য সময়। মিউজিয়াম এক ঝলক দেখে নেওয়া যায়? বাইরে বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সাজিয়ে রাখা আছে। টিকিট কেটে ভিতরের নিদর্শন সামগ্রী দেখার মতো সময় নেই হাতে। মোটে এক ঘন্টা সময় পেয়েছি। ঘড়িতে প্রায় দশটা বাজে। ভারতীকে তাড়া লাগাই — চলো চলো ফিরতে হবে, এ(ুনি বাস এসে পড়বে।

তাড়াতাড়ি পা চালাই।

দুর্গামন্দির পার হতে না হতেই দেখি, মোড়ের উপর সরকারী বাস এসে থামল। বাদামীর বাসটাই মনে হচ্ছে না? ভারতীকে বললাম – হাঁটলে হবে না, দৌড় লাগাও।

দুজনে দৌড়তে শু(করলাম। প্রাণপণে চিৎকার করে বললাম – রোককে রোককে।

আর রোককে! সরকারী বাস সরকারী চালে চলে গেল একরাশ হতাশা ছুঁড়ে দিয়ে। বলেছিল, একঘন্টা পরে ফিরবে। তা একঘন্টা ফুরোবার আগেই বাস ফুরিয়ে গেল। এখন কি করা? দিনটা আইহোলে কাটিয়ে ভালো করে জায়গাটা দেখা? নাকি হাম্পির উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া? নাহ্, আজ আমাদের হসপেট যেতেই হবে। হাম্পি আরো অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

বাসে আলাপ হয়েছিল এক কন্নড় যুবকের সঙ্গে। জানতে চেয়েছিলাম সবুজ (ে তে ওগুলো কি ফসল? জানিয়েছিল – জোয়ার। তার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল মোড়ের উপর। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারছিল। বললাম – বাসটা চলে গেল। কি করে বাদামী ফিরে যাওয়া যায় বলুন তো!

– অটো ধরে পাট্টাডাকাল চলে যেতে পারেন। নয়তো গ(ড়। ওখান থেকে আবার বাদামীর বাস পেয়ে যাবেন।

গ(ড় অচেনা জায়গা। যেতে ভরসা হল না। তার থেকে পাট্টাডাকালই ভালো। আরেকবার গতকাল-দেখা স্বপ্নের মতো সুন্দর মন্দিররাজি দেখা হয়ে যাবে। গতরাতেই ভাবছিলুম পাট্টাডাকালের আট মন্দিরের সঠিক অবস্থান চিহ্নি(ত করতে একটা ম্যাপ স্কেচ করে নিতে পারলে ভালো হত। সে সুযোগটাই এসে গেল।

খানকয়েক অটো দাঁড়িয়েছিল। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম – পাট্টাডাকাল কত নেবে?

– রিজার্ভ যাব, এক শ' পড়বে।

– সে তো অনেক টাকা! বাসে পাঁচ কি সাত টাকা ভাড়া আর অটোতে এত?

সেই চেনামুখ কর্ণাটকী ছেলেটি বলল – ওরা ওরকমই চাইবে এখন।

আশি টাকায় রফা হল। আমাদের দুজনকে নিয়ে অটো রওনা দিল পাট্টাডাকাল। পাথর ছড়ানো উঁচুনিচু ভূপ্রকৃতি। মাঝে মাঝে অনুচ্চ পাহাড়। তার কোল ঘেঁষে রাস্তা। নির্জন গিরিখাত। মাঝে মাঝে সবুজ (েতখামার ও গ্রাম। আজ কোন পূজাপার্বন আছে বলে মনে হচ্ছে। দলে দলে মেয়েরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়েছে। মন্দিরে পূজো দিতে চলেছে। ভারতী বলল – আইহোল ভালো করে দেখা হল না। বলা উচিত মোটামুটিও দেখা হয়নি, তাই না?

বললাম – ঠিক তাই। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে এত মন্দির আছে ছড়ানো ছিটোনো যে গোটা দিনেও দেখে শেষ হবে না।

আইহোলের প্রধান মন্দির-চত্বরের বিপরীতে পশ্চিমদিকে আছে আম্বিগেড়া গুড়ি। তিনটি মন্দিরের অবস্থান সেখানে। আম্বিগেড় (মাঝি) -সম্প্রদায়ের বাস কাছেপিঠে বলে নামকরণ ওরকম। একটি মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর নাগরশিখর আছে। তার মণ্ডপের দুপাশে দুটি প্রবেশদ্বার। আরেকটি মন্দিরে সূর্য বা বিষ(ুর মূর্তি আছে।

চিত্র-৭১। আম্বিগেড়া গুড়ি।

উত্তরদিকে রাস্তার বাঁহাতে চিক্কি গুড়ি মন্দির। দুটি মন্দিরের মধ্যে প্রথমটিতে অগ্রমণ্ডপ-রঙ্গমণ্ডপ-গর্ভগৃহ আছে। ৭ম শতকের নির্মাণ অনেকটা গৌড়ারগুড়ির মতো। দ্বিতীয় মন্দির ১০ম শতকের। ভগ্ন মণ্ডপ। দেবতাসন শূন্য হলেও দ্বারপাল শৈব বলে মনে হয়।

আইহোলের উত্তর দিকে রয়েছে হুচিমাল্লী-গুড়ি (হাটচিমোল্লি) মন্দির। গ্রামের বাইরে। ট্যুরিস্ট হোমের ডাইনে। বর্গাকার গর্ভগৃহ। তার উপর ত্রিরথ রেখ-নাগর শিখর। এখানেই প্রথম দেখা যায় মন্দিরের অন্তরাল ক(। গর্ভগৃহ আর মণ্ডপের মধ্যিখানে। স্তম্ভ-শোভিত মণ্ডপ ও বারান্দা রয়েছে। দেবতা বিষু(বিশালকার গোখরোর মস্তকে উপবিষ্ট। শিব ও নন্দীও আছেন। সিলিংয়ে মরালগামী ব্রহ্মার চিত্র।

কাছেই রাবণফাদি গুহা। আদি চালুক্যরীতির অন্তিম দশায় দু'টি গুহামন্দির নির্মিত হয়েছিল আইহোলে। একটি রাওলগুডি শৈব মন্দির, অন্যটি পরবর্তীকালের জৈন মন্দির। আইহোলির দ(ি ণ-পূর্ব দিকের পাহাড় কেটে রাওলগুডি (রাবণফাদী) গুহামন্দির নির্মিত হয়েছে। ৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। শিবের নানা মূর্তি আছে এখানে। বাদামী গুহামন্দিরের তুলনায় আয়তনে ছোট। স্তম্ভ আরো কৃশকায়। সামনে প্রায়-বর্গাকার মণ্ডপ এবং তার পিছনে অনুরূপ আকারের গর্ভগৃহ। বিগ্রহাসনে পাথর কেটে লিঙ্গমূর্তি বসেছে। মণ্ডপের দু'পাশে দু'টি ছোট মণ্ডপও খোদিত হয়েছে। ফলে খানিকটা ত্রিকূট মন্দিরের মতো লাগে। একটিতে আছে সপ্তমাতৃকা, অন্যটিতে শিব। পার্বতীসহ নৃত্যরত দশ হাতের নটরাজ শিব, অর্ধনারী(ের, মহিষাসুরমর্দিনী, সপ্তমাতৃকা, গণেশ ইত্যাদিও বিরাজ করছেন। প্রবেশপথে পার্বতী ও ভৃঙ্গীসহ শিব আছেন। শিবের জটাজালে আবদ্ধ গঙ্গা। সিলিং কা(কার্যময়।

পাট্টাডাকাল ফেরার পথে পড়ে মল্লিকার্জুন মন্দির। ৮ম শতকের নির্মাণ। মোট পাঁচটি মন্দির আছে। মুখমণ্ডপ রঙ্গমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ নিয়ে মন্দির। উপরে ফাসনা শিখর।

দুটি মন্দিরের নাম কৃষ(প্যাগোডা (কাড়েগুটি) ও শ্বেত প্যাগোডা (বিলেগুড়ি)। প্রথমটির মণ্ডপে ষোলোটি স্তম্ভ আছে।

আরো ভিতরে ঢুকলে ডান হাতে পড়ে মেগুথি মন্দির চত্বর। গুহামন্দিরের বিপরীতে টিলার উপরে রয়েছে দ্বিতীয় পুলকেশীর মন্ত্রী ও সেনানায়ক রবিকীর্তি দ্বারা নির্মিত এই মেগুথি মন্দির। রবিকীর্তি আবার জৈনকবি এবং আইহোল-প্রশস্তির রচয়িতা কিনা জানি না। মেগুথি মন্দির দ্রাবিড় রীতিতে তৈরী। জৈনমূর্তি রয়েছে। আদিতে জৈনমন্দির ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। শিলালিপি অনুসারে ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। প্রথম থেকেই নির্মাণকার্য অসম্পূর্ণ ছিল। বর্তমানে আংশিক বিধ্বস্ত। মূল গর্ভগৃহ ছাড়া আরো দুটি বিগ্রহবেদী আছে। অন্তরাল ও অর্ধমণ্ডপ আছে। মধ্যবর্তী অংশে সমতল ছাদ এবং পাশে চালা-ছাদ। ছোট আকারে মুখমণ্ডপ আছে। পরে বড়ো মুক্ত(মণ্ডপ যুক্ত(হয়েছে। গর্ভগৃহের উপরে মুক্ত(আকাশের নিচে আরেকটি বেদী আছে। সেটিও পরে নির্মিত।

মেগুথির নিচে রয়েছে দ্বিতল বৌদ্ধমন্দির। কিছুটা খোদাই, কিছুটা নির্মাণ। সামনের লম্বা বারান্দায় চারটি করে থাম। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে দেখা যায় সিলিংয়ে প্রশান্ত হাস্যমুখী বুদ্ধ ব্যাখ্যান মুদ্রায় খোদিত। সিলিংয়ে আরেক চিত্রে বুদ্ধের মাথা থেকে জন্মেছে বোধিবৃ(।

আছে জৈন গুহা মন্দির ও গৌরী মন্দির। ত্র্যম্বকেশ্বের মন্দির ত্রিকূটাচল ধরনের। ১২শ শতকে কল্যাণীর চালুক্যরা নির্মাণ করেছে।

হুচ্চাপ্পায়াগুডি মন্দির নামে আরো একটি মন্দির আছে নাকি। নরসোব্বা নামের স্থপতি তার নির্মাতা।

বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার মুখে বাজারের মধ্যে রয়েছে তিনটি মন্দির। কোঁথিগুডি বা কুন্তি মন্দির কমপে-ক্স। দুটি মন্দির একেবারে মুখোমুখি। মাঝে খোলা মণ্ডপ। তৃতীয়টি প্রথম মন্দিরের দ(ণে। ভাস্কর্য সুন্দর। মিথুন মূর্তি আছে। পদ্মাসীন ব্রহ্মামূর্তি চমৎকার। উমা-মহেশ্বরের সজীব ওষ্ঠদুটি নাকি নজরকাঁড়া। সিলিংয়ে আছে হেলান-দেওয়া বিষু(মূর্তি।

আরো অনেক মন্দির আছে আইহোলে। যেমন — গলগনাথ কমপে-ক্স, রামলিঙ্গ মন্দির, চরন্তি-মঠ ইত্যাদি। সব খোঁজখবর করা আমাদের মতো সামান্য পর্যটকদের প(অযথা হয়ে যায়। সাধারণ পর্যটক আর্কিওলজিকাল দপ্তরের আয়োজনে যে পার্ক করেছে তা দেখেই খুশি। বিশদে গবেষণা করা তাদের কাজ নয়।

মেগুথি পাহাড়ের কাছে মোরেরা অঙ্গাডিগালু নামক জায়গায় অনেক প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কিছু কিছু মন্দিরের কাছে খনন করে চালুক্য-পূর্ব কালের ইটের মন্দির এবং পোড়ামাটির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। খননকার্য চলছে এখনো। কে জানে একদিন হয়তো আরো অতীত দিনের ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করবে আইহোল কেন্দ্র করে!

পাট্টাডাকাল মন্দির কমপে-ক্সের কাছে যেতেই সহাস্যে এগিয়ে এল গতকালের গাইড অশোক বাডিগের। বললাম — সকালে আইহোলি গিয়েছিলাম। বাস না পেয়ে অটোতে ফিরছি।

একজন সুর(াকর্মী এগিয়ে এসে জানাল — আমি উড়িষ্যার লোক। বাংলা জানি।

বললুম — তবে তো ভাই আমাদের ঘরের লোকই। পাশাপাশি প্রদেশের মানুষ তো।

ভারতী তিনজনের ছবি তুলল। মন্দিরগুলির অবস্থান দেখিয়ে একখানা ম্যাপ স্কেচ করে নিলাম। সেই সঙ্গে গোটা এলাকার আরো ছবি তুললাম।

বারবার মনে হচ্ছিল, আরেকবার এখানে আসতে হবে। আইহোল গুছিয়ে দেখা হল না। পাট্টাডাকালে আরো কিছু সময় কাটাতে পারলে ভালো লাগত। বাডিগের হাতজোড় করে নমস্কার জানাল — আবার আসবেন।

উত্তর কর্ণাটক যাওয়ার হ্যাপা অনেক। তাই বোধহয় এদিকটায় বাঙালি পর্যটকদের যাতায়ত কম। এরা দেখলাম দুজন বাঙালিকে চেনে। একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন সৌরভ গাঙ্গুলি।

বাস নেই। মিনিবাস ধরে ফিরছি বাদামী। ঠাসা ভিড়। নিশ্চয়ই আজ কোন উৎসব বা পূজোর দিনটিন আছে। দিনটা উনিশে শ্রাবণ। কোন বিশেষদিন বলে তো ঠাহর হচ্ছে না। ঠেসে লোকজন উঠল পথে। মেয়ে এবং বাচ্চাই বেশি। চলেছে কলকল করতে করতে। পু(ষরা তো প্রায় ঝুলে ঝুলেই চলল। ওরা আমাদের ভাষা জানে না। আমরাও জানি না ওদের ভাষা। তবু আমরা এক দেশের নাগরিক!

অদূরে বেলগাঁও — অতীত কালে এর নামও ছিল নাকি বিজয়নগর। তা থেকে পরে বেলগাঁও। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে চালুক্যদের রাজধানী ছিল এই বেলগাঁও। পরে তা বিজাপুরের দখলে যায়। এখানে অন্যতম দর্শনীয় ঘাটপ্রভা নদীর উপর গোকক জলপ্রপাত — বাহান্ন মিটার উঁচু থেকে তার নির্দয় জলপতন। বেলগাঁও থেকে বাষট্টি কিলোমিটার দূরে। খবরটুকুই শুধু সংগ্রহ করে রাখা গেল। যাওয়া তো হচ্ছে না এবার।

৮। হসপেট

বাদামী থেকে হসপেটের বাস সকালে ছাড়ে। আমাদের আইহোল যেতে হয়েছিল বলে ধরতে পারিনি। তাই এবার গডগ হয়ে য়েতে হবে।

হোটেলে লাঞ্চ সেরে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দেখি স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে গোটা এলাকা জুড়ে। বাস এলেই তারা দৌড়ে যাচ্ছে, গাড়িতে ওঠার লাইনে ভিড় জমাচ্ছে। এদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বাসে ওঠা আমাদের প(সম্ভব নয়। ভিড় না কমলে সুরাহা হবে না মনে হচ্ছে। সাতপাঁচ ভাবছি। একটু পরে গডগের বাস এলো। ভিড় হলেও আমরা সহজে উঠতে পারলাম। বসার আসনও পেলাম।

বারোটা নাগাদ বাস ছাড়ল। গাড়ি সোজা গডগ যাবে না, একটু ঘুরে রণ হয়ে যাবে। দূরত্ব ৭০ কিলোমিটারের মতো। ভাড়া জন প্রতি বত্রিশ টাকা। বাসের ভিড় একটু চলার পরেই কেটে গেল। দেখতে দেখতে গডগ পৌঁছে গেলাম।

সবাই বলেছিল গডগ থেকে হসপেটের বাস পাওয়া যায় সহজেই। সত্যিই তাই। একটু পরে একখানি বাস এসে দাঁড়াল আর 'হসপেট হসপেট' বলে ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর চিৎকার করতে লাগল। অনেক যাত্রী নামল বলে আমরা বাস উঠে বসার সিটও পেয়ে গেলাম।

গডগ থেকে হসপেটের দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। কণ্ডাক্টর ভাড়া নিল উনচল্লিশ টাকা করে। জোগ থেকে যদি আসা হত, তবে সাগর-শিমোগা হয়ে হসপেটের দিকে যেতে হত। জোগ থেকে শিমোগা ১০৩ এবং শিমোগা থেকে হসপেট ১৯৭ কিলোমিটার ।

হাম্পি দেখতে হয় তেরো কিমি দূরের হসপেটকে কেন্দ্র করে। চুয়াত্তর কিলোমিটার দূরে বেলারি নিকটতম বিমানবন্দর। বেলগাঁও ১৯০ কিলোমিটার এবং ব্যাঙ্গালোর ৩৫৩ কিলোমিটার দূরে। কর্ণাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অফিস আছে হসপেটে। ঠিকানা তালুক অফিস সার্কল, ট্রান্সপোর্ট উইং, হসপেট। আমরা থাকার জন্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম মালিগে ট্যুরিস্ট হোম।

জাতীয় সড়ক-৬৩ ধরে হুহু করে বাস দৌড়ল। লাখুণ্ডি কোপ্পল হয়ে হসপেট পৌঁছে গেলাম বেলাবেলি। সোজাসুজি হাম্পিতে চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল যাতে কর্ণাটক ট্যুরিজম হোটেলে থাকা যায়। শেষ পর্যন্ত ভরসা হল না। ভেবে দেখলুম, মেন বাসস্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি থাকাই সুবিধেজনক। পরবর্তী বাস-জার্নিতে মালপত্র নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া কম করতে হবে।

হসপেট বাসস্ট্যাণ্ড বিশাল চত্বর জুড়ে। যাত্রীদের অপে(া করার জন্য অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাউনি আছে। ক্যান্টিন দোকানপাট এনকোয়ারি এসটিডি-বুথ কী নেই

সেখানে! সিমেন্ট বাধানো বেঞ্চিতে ভারতীকে বসিয়ে মালপত্র রেখে খোঁজখবর করতে গিয়েছি হাসানের বাস কখন ছাড়েটাড়ে সেসব জানতে। পাশেই বুকস্টল। হাম্পির উপর ভালো দুটো বই চোখে পড়ল। প্রত্য(দর্শী এক বিজয়নগর-ভ্রমণকারীর অনুবাদ গ্রন্থ। অতিকষ্টে বই কেনার লোভ সংবরণ করলাম।

ফিরে এসে দেখি ভারতীর পাশে বেঞ্চির উপর বসে এক অচেনা ভদ্রলোক। দুজনে খোশ মেজাজে গল্প জুড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ হলেও নিপাট বাংলায় কথা বলছেন। বাংলায়? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম — আপনি বাঙালি নাকি?

— না না বাঙালি নয়। তবে বাংলা জানেন। ভারতী জানায়।

ভদ্রলোকের নাম সুভাষচন্দ্র ওঝা। বাড়ি হায়দ্রাবাদ। বিশেষ কোয়ালিফিকেশন, উনি বার বছর ধানবাদ-বোকারো এলাকায় কর্মরত ছিলেন। বাংলা বুঝতে তো পারেনই, বলতেও পারেন। এখানে ব্যবসার কাজে এসেছেন। বন্ধুর আসার কথা ছিল — তার জন্য অপে(া করছিলেন। বন্ধু আসেনি, হোটেলের ঘরে ফিরেই বা কি করবেন, তাই এমনি বসেছিলেন। মানুষজন দেখছিলেন। ভারতীকে দেখে মনে হল নিশ্চয়ই বাঙালি। তাই যেচে আলাপ করতে বসেছেন।

— আপনারা কোথায় উঠবেন? সুভাষচন্দ্র প্র(করলেন।

— ঠিক করা নেই কোন হোটেল। তবে ভেবেছি মালিগে না কি যেন নাম, সেই হোটেলে উঠব। মহাত্মা গান্ধী রোডে। আপনি কোথায় উঠেছেন?

— এই তো একটু এগিয়ে পাশের হোটেলে। বেশ ভালো হোটেল। দুশ' দশ টাকায় মোজেইক-টালি বসানো ঘর বড়ো বাথ(ম। খুব ভালো ব্যবস্থা। দেখতে পারেন একবার। বেশি দূরেও নয়। হোটেলের নাম কার্তিক, হোটেল কার্তিক।

সন্দেহবাতিক শহুরে মন আমাদের। ঠিক বুঝতে পারছিনা। এরকম গায়ে পড়ে যেচে আলাপ করে হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছে একজন অচেনা ব্যক্তি(, ব্যাপারটার মধ্যে কুমতলব নেইতো? সত্যি কথা বলতে কী, ভদ্রতার খাতিরে সেকথা মুখ ফুটে বলতেও পারছি না। অবশেষে অনেক সাহস সঞ্চয় করে বললুম — আচ্ছা চলুন তো, একবার গিয়ে দেখা যাক আপনার হোটেল পছন্দ হয় কিনা!

মনে মনে ভাবছি, যাচাই করে নেওয়া যাক না! পছন্দ হল না বলে বেড়িয়ে আসতে তো বাধা নেই। এমনিতে ভদ্রলোককে সরল সাদাসিধে মনে হল। তবে মানুষ অতি বিচিত্র জীব! চতুর মানুষও তো দা(ণ সরল সাজতে জানে। আমরা তার বেশ কয়েকটি নমুনা জানি। তাদের সারল্য একটা ভান।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে একটু এগিয়ে তারপর আবার বাঁদিকে ঘুরলাম। কয়েক পা হেঁটে আবার ডানদিকে। খানকয়েক বাড়ির পরেই হোটেল। বাইরে থেকে

ভালোই লাগল। ভারতী তো ঘর দেখেই পছন্দ করে ফেলল। তবে একতলায় নয়, দোতলায় থাকতে চায়। ওঝার ঘর একতলায়। উনি বললেন – ঠিক আছে, আপনি উপরে চলে যান, আমিও ঘর বদলে দোতলায় যাচ্ছি। পাশাপাশি থাকব। জমিয়ে গল্প হবে'খন।

ঘরভাড়া তিনশ' ত্রিশ পড়বে শুনে সুভাষচন্দ্র অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ম্যানেজারকে বললেন – আমাকে দিলেন দুশ' দশে আর ...

– সে তো সিঙ্গল অকুপেন্সির জন্য। ডাবল অকুপেন্সির রেট তিনশ' ত্রিশ। এই দেখুন রেট কার্ড। বলে হাতে ছাপানো রেটকার্ড ধরিয়ে দিল হোটেল ম্যানেজার।

ভেবে দেখলাম অকুপেন্সির প্রস্তাবটা যুক্তি(সঙ্গত। দেখেশুনে হোটেল ভালোই মনে হচ্ছে। প্রশস্ত করিডোর, ঝা-চকচকে মেঝে। রাস্তার উপর গে-াব জ্বলছে। সিদ্ধিদাতা গণেশও আছেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখে রিসেপশনে। দুজনের ঘরভাড়া দৈনিক তিনশ' তিরিশ টাকা এমন কি আর বেশি চাইছে। রাজি হয়ে গেলাম।

একটু পরে সুভাষচন্দ্রও মালপত্র নিয়ে দোতলার ঘরে চলে এল। চা আর পকোড়া খেতে খেতে আলাপ পরিচয় হল আমাদের ঘরে বসে। ভারতী বলল – শুনুন আমাকে বৌদি বলে ডাকবেন না। আপনাকে দেখতে আমার ছোড়দার মতো লাগছে। আপনি আমাকে দিদি বলবেন। আমিও দাদা বলে ডাকব।

ওঝাজি সানন্দে রাজি। বললেন – তাহলে তো আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকতে হবে।

– তাতো ডাকতেই হবে। সুদূর কর্ণাট প্রদেশে এসে আস্ত একটি শ্যালক লাভ হল যে।

সুভাষচন্দ্র প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত। রিফ্রাক্টরি গুড্সের ব্যবসা। হায়দ্রাবাদে সেটেলড। অর্ডারের ব্যাপারে এসেছেন গতকাল। দিন দুই থাকতে হবে। বাড়িতে স্ত্রী আর ছোটো ছেলে আছে। বড়ো ছেলেটি বিলেতে কম্প্যুটার নিয়ে পড়াশোনা ও কাজকর্ম করছে।

একটু পরে তিনজনেই বাইরে বেরোলাম। কোলকাতায় ফোন করতে হবে। কোথায় কেমন আছি তা জানাতে হবে তো। দীপিকা আগের দিন বলেছিল – বাদাম খেতে খেতে কেমন বাদামী ঘুরলেন? সে কথার রেশ টেনে ওকে এবার বলতে হবে – দ্যাখো, হাসতে হাসতে কেমন হসপেট এসেছি।

আত্মীয়স্বজন-প্রিয়জন কে কেমন আছে তাও জানতে হবে। দূরে গেলে আপন লোকজনের উপর দেখেছি টান বাড়ে। সুভাষজিও গিন্নির সঙ্গে কথা বললেন। বাস টার্মিনাসে গিয়ে আরেকবার হাসানের বাসের খোঁজ করলাম। নিশ্চিত হওয়ার জন্য

ডাবল-চেক করা দরকার। টুকিটাকি জিনিস কেনার ছিল, সেসব কেনা হল। তারপর হোটেলে ফিরে গেলাম।

সুভাষজি বসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে কোথায় চলে গেলেন। কী অদ্ভুতভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের আলাপ হয়! অথচ প্রথমে তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছি। সেকথা মনে হতে এখন লজ্জা পাচ্ছি।

ঘরে বসে টিভি দেখছি। দুনিয়ার হালহকিকত জানা হচ্ছে। একগুচ্ছ চ্যানেল। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি। বেয়ারা এসে খবর দিল যে দশটার পরে বন্ধ হয়ে যাবে কিচেন।

এদিকে সুভাষজি তখনো ফেরেননি। একসঙ্গে রাতের ডিনার খেতে যাওয়াই উচিত। এদিকে দশটা বাজতে চলল। কিছু(ণ অপে(া করে তারপর চলে গেলাম ডাইনিং হলে। রিসেপশনে বলে রাখা হল যে সুভাষজি এলে তাকে যেন ডাইনিংয়ে পাঠিয়ে দেয়।

বেয়ারা জানাল – আপনারা ডাইনিং হলে বসতে পারেন অথবা বাইরে।

মুক্ত(আকাশের নিচে সবুজ ঘাসের উপর আলো-আঁধারে খানকয়েক টেবিল পাতা। দু'জন সাদা চামড়ার মানুষও বসে আছেন পাশের টেবিলে। সুভাষজি এলেন না। কি আর করা! আমরা ডিনার সেরে কামরায় ফিরে গেলাম।

আগামীকাল হাম্পি-যাওয়া আছে। ক্যামেরায় রিল ভরতে গিয়ে কেচ্ছা হয়ে গেল। ফিল্ম ঢুকে গেল রোলের মধ্যে। কাল সকালে নতুন রিল কিনতে হবে। ভোরবেলায় ফটোর দোকান খুলবে কি না কে জানে! হসপেট থেকে কিনতে পারলেই ভালো হয়। হাম্পি থেকে কিনতে চাই না। ট্যুরিস্ট স্পটে ট্যুরিস্ট ঠকানোর ব্যাপার থাকে তো!

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। বেশি রোদ চড়ার আগে পৌঁছতে হবে সেখানে।

৯। বিজয়নগর

হাম্পির অন্য নাম বিজয়নগর তথা বিদ্যানগর। মধ্যযুগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল হাম্পি। নগরের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তুঙ্গভদ্রা – প্রাচীন নাম পম্পাবতী। পম্পা থেকেই ভেঙেচুরে হাম্পি কথাটি এসেছে নাকি। পম্পা নামে তুঙ্গ ভদ্রার এক উপনদীও আছে। তবে সর্বসাধারণের কাছে পম্পা মানে তুঙ্গভদ্রাই।

ভারতীকে বললাম – পম্পা বললে রামায়ণ-সীতার কথা মনে পড়ে যায় না? কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের কথা, বালি-সুগ্রীব-হনুমানের কথা?

– এই কি সেই পম্পাবতী?

– হ্যাঁ, এই সেই পম্পা-(ে ত্র। কিষ্কিন্ধ্যা-(ে ত্র ও ভাস্কর-(ে ত্র নামেও পরিচিত।

বিজয়নগরের ইতিহাস অল্পসল্প না জানা থাকলে হাম্পি ভ্রমণ সুন্দর হয় না। স্কুলের পাঠ্য বইতে ছিল বিজয়নগরের কথা। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলে, দেবদ্যুতির মতো অনেকেই বলে ওঠে – হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছিলাম বটে, কৃষ(দেব রায়, চেনা চেনা লাগছে নামটা। ও সব তো শর্টনোটে পড়তে হত। বাদ দিয়ে গিয়েছি।

আমাদের একটু ইতিহাসচর্চা করে নিতে পারলে ভালো হয়। ইতিহাসের আগে পুরাণকথা শুনতে হবে। ঠিক পুরাণকথাও নয়। বলা উচিত মহাকাব্যের কথা, মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ-কথা। রামায়ণে যেমন অযোধ্যা আছে, লঙ্কা আছে, তেমন কিষ্কিন্ধ্যাও আছে। বালি-সুগ্রীবের বানররাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা ছিল নাকি হাম্পির অনতিদূরে। চার পর্বত ছিল – মাতঙ্গ, মাল্যবন্ত, ঋষ্যমূক ও অঞ্জনগিরি। সেসব পর্বত এখনো বর্তমান হাম্পিতে।

– এখনও আছে সেসব, সেই পম্পা নদী ও পম্পা-সরোবর, এই ধরিত্রীতে?

বললাম – আছে। কিছু বাস্তবে, কিছু মানুষের ঐকান্তিক বি(্বাসে।

প্রাসঙ্গিক সূত্রপাত এরকম। বানর রাজ বালি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সুগ্রীব-হনুমানাদি চার সঙ্গীসাথী নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলেছেন আকাশপথে। লঙ্কার দিকে। পর্বতশীর্ষে বানরদের দেখে সীতা তাঁর উত্তরীয় এবং অলঙ্কারাদি নি(ে প করেন নিচে। উদ্দেশ্য শ্রীরামকে বার্তা পাঠানো। বানরেরা সীতার পতিত বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করে রেখে দিল একটি গুহায়।

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে হারিয়ে বিলাপ করছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁকে সামলাচ্ছেন। দু'জনে খোঁজখবর করছেন কোথায় সীতা। এমতাবস্থায় তাঁদের দেখা হল এক কবন্ধের সঙ্গে। আরণ্যকাণ্ডের প্রায় শেষভাগে একোনসপ্ততিতম সর্গে ঘটনাটি লেখা হয়েছে।

চিতা হতে উঠে শ্রী নামক দানবের পুত্র দনু কবন্ধরূপ ত্যাগ করে রামকে জানালেন – তিনি কি উপায়ে সীতাকে লাভ করতে পারবেন। তাঁকে বললেন, ঋ(রাজার (ে ত্রজ ও সূর্যের ঔরস পুত্র সুগ্রীবের কাছে যেতে হবে তাঁকে। ইন্দ্রপুত্র বালী তাঁর ভাই। সুগ্রীব চার বানরের সঙ্গে রয়েছেন পম্পানদীর তটে ঋষ্যমূক পর্বতে। ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত ঐ পর্বত। কাছেই মতঙ্গবনে শবরীর আশ্রম। অনন্ত প্রতী(া নিয়ে বসে-থাকা শবরী।

কবন্ধের উপদেশ মতো শ্রীরাম কিষ্কিন্ধ্যার দিকে যাত্রা করলেন।

পম্পার নদীতট অপরূপ সৌন্দর্যের আকর। সেখানে পৌঁছে দেখেন – '... ঐ নদী অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকসিত রহিয়াছে। সর্বত্র কোমল বালুকণা, মৎস-কচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান ক(ারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক(কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতাসকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃ(কে আলিঙ্গন করিতেছে, কোন স্থান ময়ূর রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব, য(ও রা(সেরা বিচরণ করিতেছে এবং কোথাও বা কুসুমিত আম্রবন। রাম ঐ পম্পা নদী দর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন।' বলে রাখি, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত 'রামায়ণ' থেকে উদ্ধৃত হচ্ছে রামায়ণের এসকল কথা।

পম্পানদীর তটে বসে শ্রীরাম একবার কাতর হচ্ছেন আবার পর(ণেই চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হচ্ছেন। ল(্মণকে বলছেন – 'বৎস! এই পম্পার জল বৈদূর্যের ন্যায় নির্মল, ইহাতে পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার তীরস্থ বন অত্যন্ত রমণীয়(এই বনে বৃ(গুলি শাখাসমূহে সশৃঙ্গ পর্বতবৎ শোভা পাইতেছে। ইহা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ এবং মৃগ ও প(গণে আকীর্ণ। যদিও আমি সীতাহরণে ও ভরতের দুঃখস্মরণে শোকাকুল রহিয়াছি, তথাচ এই শুভদর্শনা পম্পা আমার অত্যন্তই সুন্দর বোধ হইতেছে।'

সীতার বিরহ শোক ও সন্তাপ দূর করে যে স্থান তার সৌন্দর্য অবশ্যই অতুলনীয় হবে। তা না হলে শ্রীরাম শোক কিছু(ণের জন্য হলেও বিস্মৃত হয়ে নিসর্গ সৌন্দর্যে মোহিত হতে পারেন?

'ঐ দেখ নীলপীতবর্ণ তৃণময় স্থান কি সুদৃশ্য, বৃ(ে র বিবিধ পুষ্প পতিত হওয়াতে উহা যেন চিত্র কম্বলে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। ইতস্ততঃ পুষ্পস্তবক-শোভিত লতা, ঐগুলি গিয়া পুষ্পভারপূর্ণ বৃ(ে র অগ্রশাখা আলিঙ্গন করিতেছে। বৎস! এ(ণে কামোদ্দীপক বসন্ত উপস্থিত, সুখস্পর্শ বায়ু বহিতেছে(পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং সর্বত্রই সুগন্ধ। ঐ দেখ, মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে, সেইরূপ এই পুষ্পিত বন পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। বৃ(সকল বায়ুবেগে কম্পিত হওয়াতে সুরম্য শিলাতল পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক

পুষ্প পড়িয়াছে, অনেক পুষ্প পড়িতেছে এবং অনেক পুষ্প বৃ(রহিয়াছে, সুতরাং সর্বত্র বায়ু যেন পুষ্পগুলিকে লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। শাখাসকল বিকসিত কুসুমে সমাচ্ছন্ন, বায়ু তৎসমুদায় কম্পিত করত বহিতেছে এবং ভ্রমরগণ গুনগুন স্বরে উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।'

বর্তমানে এমন পম্পা নদী এবং নদীতীরবর্তী কানন কি দেখা যাবে? একদা হয়তো পম্পা স্বচ্ছসলিলা ছিল, চত্র(বাক ও হংসেরা বিচরণ করত, সুগন্ধি রক্ত(বর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হত। কিন্তু আজ? মহাকবির লেখনীতে নিসর্গ বর্ণনা অসাধারণ। পাঠকজন মার্জনা করবেন, দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত করার জন্য। পম্পাবতীর রূপশোভা পাঠ করে আমিও রামের মতো মুগ্ধ হয়ে ছিলাম।

রামের জবানিতে কবি বলে চলেছেন — 'ঐ দেখ, রমণীয় অরণ্যে কিন্নরগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। এই স্বচ্ছসলিলা পম্পা, ইহাতে চত্র(বাক ও হংসেরা বিচরণ করিতেছে, মৃগ ও হস্তিদল পিপাসার্ত হইয়া আসিয়াছে, সুগন্ধি রক্ত(বর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া ত(ণ সূর্যবৎ শোভিত হইতেছে এবং ইহা ভ্রমরনি(প্ত পরাগে পূর্ণ রহিয়াছে। পম্পার শোভা অতি চমৎকার এবং ইহার তীরস্থ বনমধ্যে কোন কোন স্থান একান্তই রমণীয়। ঐ দেখ, ইহার নির্মল জলে পদ্মসকল পবনাঘাতজনিত তরঙ্গবেগে বারংবার আহত হইতেছে।'

'ঐ দেখ, একটি হংস পম্পার স্বচ্ছ সলিলে আমার মনোবিকার বর্ধিত করিয়া হংসীর সহিত বিহার করিতেছে। এই নদী কি সুদৃশ্য! জগতে ইহার যে-সমস্ত মনোজ্ঞ গুণ প্রচার আছে, তাহা অলীক বোধ হয় না। এ(ণে যদি আমি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই, যদি এই পম্পাতটে তাঁহার সহিত সহবাসে কাল(প করি, তাহা হইলে ইন্দ্রত্ব কি অযোধ্যা কিছুই চাহি না। এই রমণীয় তৃণশ্যামল প্রদেশে সীতার সহিত বিহার করিলে নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ হই। বৎস, আমি কান্তাবিরহী, এ(ণে এই বিচিত্রপত্র বৃ(সকল পুষ্পশ্রী বিস্তারপূর্বক এই স্থানে যারপরনাই আমায় চিন্তাকুল ও কাতর করিতেছে।'

অনতিকাল পরে রামলক্ষ্মণ মাতঙ্গ পর্বতে সুগ্রীব-হনুমানের সা(াত লাভ করেন। সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য হয়। বালিকে বধ করে রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত(করেন। এরপর হনুমান এবং অন্যান্য বানরসেনা সীতার অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিকে। রাম তখন মাল্যবন্ত পর্বতে বসে অপে(া করছেন। অবশেষে হনুমান সীতার সংবাদ নিয়ে রামের কাছে আসেন। রাম সঙ্গীসাথী নিয়ে সীতা উদ্ধারে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করেন।

মহাকাব্যে যা বলা হয়েছে সব নিছক কল্পনা? জানি মহাকাব্য ইতিহাস নয়। তবে কাব্যের মধ্যেও বাস্তবতার খানিক ভিত থাকে বৈ কী। এই যে নিম্বপুরম গ্রামে উঁচু ঢিবি আছে যাকে বালির সমাধিস্থল বলছে, বা তুঙ্গভদ্রার দ(ণকূলে যে গহ্বরে সুগ্রীব সীতার

অলঙ্কারাদি সংর(ণ করে রেখেছিলেন, অথবা গহ্বরের পাথুরে দেয়ালের দাগ সীতার অলঙ্কারের দাগ, এসব কি বাস্তবতার প্রমাণ? নাকি কাব্য বাস্তবায়িত করতে মানুষী প্রচেষ্টা? জ্ঞানীগুণীজনেরা একরকম বলবেন। আমজনতা আরেকভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

মহাকাব্যের কথা থাক। ইতিহাস কি বলে জানার চেষ্টা করি।

হাম্পির ইতিহাস সম্ভবত নিওলিথিক বা চ্যাল্কোলিথিক সময়কাল থেকে শু(হয়েছে। মানে নব্যপ্রস্তর যুগের বা চুনাপ্রস্তর যুগের প্রাক-ইতিহাসে। সত্য-ত্রেতা জাতীয় যুগ থেকে নয়। মানুষ তখন পাথর থেকে অস্ত্র নির্মাণ করে আহার্য সংগ্রহ করতে অরণ্যে বিচরণ করত, পশুর আত্র(মণ থেকে আত্মর(া করত এবং জীবনধারণের অন্যান্য কাজকর্মের উপকরণ তৈরী করত। ঐ সব মানুষের ব্যবহার্য নানা প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে কাছাকাছি এলাকায়। পুরাতত্ত্ব এরকম কথাই বলে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর প্রাক-ইতিহাস থেকে ইতিহাসের রাজ্যে পদার্পণ হয়েছে কোন এক অজানা কালে।

আর্যসভ্যতা বিস্তার এবং বুদ্ধ-মহাবীরের কয়েক শতক পরে আমরা মৌর্য যুগে প্রবেশ করি। সম্রাট অশোকের রাজ্যসীমানার মধ্যেও ছিল বোধ হয় এই ভূখণ্ড। দু'টি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়েছে সা(্য হিসেবে। পাওয়া গিয়েছে দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মীলিপি এবং টেরাকোটা সিল।

তারপর এখানে রাজত্ব করেছে সাতবাহন, কদম্ব, বাদামীর চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, কল্যাণীর চালুক্য, হোয়সাল ও যাদব বংশ। কখনো নানা উপজাতি প্রধানেরাও। যেমন কু(গোডু অ্যানেগন্ডি, কাম্পিলির প্রধানেরা। হাম্পির বিশেষ গৌরব তারও অনেক পরে। দিল্লির মসনদে তখন সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক।

দা(ণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের কাম্পিলিতে এক সর্দার ছিলেন কাম্পিলাদেব নামে। ছিলেন ১৩০৩ থেকে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সম্ভবত দেবগিরির যাদব শাসক রামদেবের অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে। পিতার নাম মুম্মুদি সিঙ্গা। হোয়সাল বংশের তৃতীয় বল্লালের বি(দ্ধে যুদ্ধের সময় সর্দার কাম্পিলাদেব হয়তো ঐ রামদেবকে সাহায্য করেটরে থাকবেন। সেই সূত্রে কাম্পিলার প্রতি দেবগিরি রাজার বিশেষ আনুকূল্য বর্ষিত হয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কাম্পিলাদেবও আপন আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

এর কিছুকাল পরে দিল্লির সুলতান তুঘলক দেবগিরি রাজ্য জয় করলেন। সেই সুযোগে কাম্পিলি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ত্র(মে অন্যান্য এলাকা জয় করে পরাত্র(মশালী রাজ্য হয়ে ওঠে।

তেলেগু (?) বংশীয় সঙ্গমের পাঁচ পুত্র – হরিহর, কম্পণ, বুক্ক, মারপ্প ও মুদপ্প। ইতিহাসে অবশ্য হরিহর-বুক্ক, এ দুজনের কথা বলা হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওয়ারাঙ্গলের রাজা প্রতাপ(দ্রের অধীনে কর্মচারী ছিলেন হরিহর ও বুক্ক নামে সঙ্গমের পুত্রদ্বয়। সে সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত হোয়সালের তৃতীয় বল্লাল, ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপ(দ্র ও দিল্লির সুলতানের মধ্যে। দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক বারকয়েক অভিযানও করেন দা(িণাত্যে। অবশেষে ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান ওয়ারাঙ্গল জয় করলেন। তখন হরিহর-বুক্ক কাম্পিলি রাজ্যে এসে আশ্রয় নিলেন। ত্র(মে কাম্পিলির রাজ-কোষাগারের কর্মচারী পর্যন্ত হলেন।

এর তিনচার বছরের মধ্যেই, সম্ভবত ১৩২৬-২৭ সাল নাগাদ, কাম্পিলি রাজ্য দিল্লির দখলে চলে যায়। রাজ্য বিজিত হলে মহম্মদ বিন তুঘলকের হাতে বন্দী হয়ে হরিহর-বুক্ককে দিল্লি চলে যেতে হয়। শুধু তাই নয়। তাদের ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বেচ্ছায় না কৌশলগত কারণে বলা যায় না।

ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে নানা ঘটনাচত্রে(কাম্পিলির শাসক হয়ে দেশে ফেরে এলেন হরিহর তথা হুক্কা আর তাঁর সঙ্গে এলেন ভাই বুক্কা। কিছুদিন পরে বাসনা হল যে তাঁরা রাজা হবেন, স্বাধীন হিন্দু রাজা। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের গু(বিদ্যারণ্যের সাহচর্যে মুসলিম হরিহর-বুক্কা আবার হিন্দুধর্মে ফেরে এলেন। রাজ্য গড়লেন হস্তিনাবতীতে। আরো কয়েক বছর পরে, ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ রাজধানী স্থাপন করলেন পম্পা নদীর তীরে। নাম রাখা হল বিজয়নগর। গুরু বিদ্যারণ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধে রাজ্যকে বিদ্যানগর নামও দেওয়া হল।

দ(িণে পুরোনো অ্যানেগণ্ডা দুর্গের বিপরীতে রাজধানী তথা দুর্গ নির্মাণ শু(হল। সম্পূর্ণ হল সাত বছর পরে। এভাবে ইতিহাসে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সূচনা হল। বিজয়নগর রাজারা নিজেদের বিরূপা(দেবের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন। তাঁরা যে শিরস্ত্রাণ ধারণ করতেন তাতে বরাহ চিহ্(অঙ্কিত থাকত।

সঙ্গম বংশতিলক প্রথম হরিহরের রাজত্বকাল ছিল ১৩৩৬ থেকে ১৩৫৭খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। দীর্ঘ একুশ বছর। তাঁর মৃত্যুর পরে বুক্ক রাজত্ব করেন আরো বিশ বছর ধরে। তিনি নাকিসুদূর চিনদেশে রাজদূত অবধি প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সময় রাজপুত্র কুমার কম্পনের বীরত্বে মাদুরার সুলতান যুদ্ধে পরাস্ত হন। বুক্ক সুদূর দ(িণ দেশ অবধি হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

বুক্কর পরে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হলেন তাঁর সন্তান দ্বিতীয় হরিহর। তিনি সাতাশ বছর রাজত্ব করেন। ত্র(মে প্রথম দেবরায় (১৪০৪-১৪২২ খৃঃ) ও দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-১৪৪৬ খৃঃ) বিজয়নগরের রাজা হলেন। ঐসময়ে দু'জন পরিব্রাজক বিজয়নগরে

এসেছিলেন। ১৪২০-২১ সালে এসেছিলেন ইতালির বণিক-পর্যটক নিকোলো দ্য কন্টি (১৩৮৫-১৪৬৯)) এবং ১৪৪৩ সালে পারস্যের তৈমুর বংশীয় রাজা শাহরুখের রাষ্ট্রদূত কামাল উদ্দিন আবদুর রজ্জাকইবন ইশাক সমরখণ্ডী, সং(পে আবদুর রাজ্জাক, (১৪১৩-১৪৮২))। তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় সেসময়ের নানা কথা। কন্টি বলেছিলেন হাম্পির রাজ্যের নাম বিজেনগালিয়া। রাজ্জাক বলেছেন বিদ্যানগর (বিদজানগর)।

সঙ্গম বংশের শেষ রাজা ছিলেন মালিকার্জুন। এরপর রাজ্যে কিছুকাল আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। সুযোগ বুঝে বাহমনী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মামুদ গাওয়ান রাজ্যের কিছুটা অংশ দখল করে নিল। এমতাবস্থায় চন্দ্রগিরির রাজা নরসিংহ সালুভ বিজয়নগর রাজ্যের সিংহাসন দখল করে বসলেন। বলা যায়, আরো বিশৃঙ্খলার হাত থেকে সাম্রাজ্য র(া করলেন। এতদ্বারা সালুভ বংশ প্রতিষ্ঠিত হল। নরসিংহের পরে নৃপতি হলেন ইম্মাদি নরসিংহ।

তুলুভ বংশের সেনানায়ক ছিলেন নরসা নায়ক। ১৪৯২ সালে নরসা নায়ক নাবালক রাজা ইম্মাদি নরসিংহকে বন্দী করেন এবং রাজ্য দখল করে আপন শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। পরে তাঁর পুত্র ইম্মাদি নরসা নায়ক (বীর নরসিংহ) (মতায় অধিষ্ঠিত হলেন। অল্পকাল পরেই ১৫০৫ সালে নাবালক-রাজা ইম্মাদি নরসিংহকে হত্যা করে ইম্মাদি নরসা নায়ক রাজা হলেন। চার বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি।

১৫০৯ সালে বীর নরসিংহর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কৃষ(দেব রায় রাজা হলেন। বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এই কৃষ(দেব রায়। কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। বিজয়নগরের সুবর্ণযুগ তাঁরই আমলে। তিনি নিজে জ্ঞানী ও কবি ছিলেন। রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিল অষ্টদিগ্গজ পণ্ডিত। যশস্বী তেলেগু কবি অল্লসানি পেদন্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তি(পতি মন্দিরে এখনও রাজা কৃষ(দেব রায় এবং তাঁর দুই রানির তাম্রপটে অঙ্কিত চিত্র র(িত আছে।

চিত্র-৭২। কৃষ(দেবরায়ের মূর্তি, হায়দ্রাবাদ।

১৫২০ সালে পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনগো পেজ বিজয়নগরে আসেন। এসেছিলেন আরেক পর্তুগিজ পর্যটক ফার্নাও নুনিজ ১৫৩৫-১৫৩৭ সালে এবং বি(েপর্যটক ম্যাগেল্লার শ্যালক দুয়ার্তে বার্বোসা (?-১৫২১)। আমরা এদের বিবরণ থেকেও অনেক কথা জানতে পারি।

কৃষ(দেব রায়ের মৃত্যু হলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অচ্যুত রায় (১৫২৯-১৫৪২ খৃঃ) রাজা হন। তিনি তেরো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর আমলের সভাকবি রাজনাথ ডিণ্ডিমা

'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়' নামের কাব্য রচনা করেন। তাঁর পরে শিশুপুত্র প্রথম ভেঙ্কট রাজা হলেন। কিছুকাল পরে তাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করলেন ভাইপো সদাশিব রায় (১৫৪২-১৫৭৬ খৃঃ)। বলা হয় সদাশিব রায় রাজা হলেও প্রকৃত (মতা ছিল নাকি কৃষ(দেব রায়ের জামাতা রামা রায়ের হাতে। রামা রায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করে সুন্দরভাবে আপন স্বার্থর(া করে চলছিলেন। কিন্তু শেষর(া করতে পারলেন না। একদিন মুসলমান শাসকগণ সম্মিলিতভাবে বিজয়নগর রাজ্য আত্র(মণ করল।

১৫৬৫ সালের ২৩শে জানুয়ারী। কৃষ(ার তীরে র(সি-তঙদি গ্রামের কাছে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরকে পরাস্ত করে পাঁচ শাহী রাজ্য — বিদার, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর এবং বেরার। একে তো পাঁচ বাহিনীর জোট যুক্ত(হয়ে যুদ্ধ করছে, তার উপর বিজয়নগর বাহিনীর দুই মুসলিম সেনাপতি যুদ্ধে নিস্ি(য় হয়ে রইল। সুতরাং সমূহ পরাজয় ঘটল বিজয়নগরের। বন্দী হলেন রাজা রামা রাও। নিজ হাতে তাঁর শির(ছেদ করেন আহমেদনগরের সুলতান।

রামা রাওর ভাই তি(মালা অর্বাচীন রাজা সদাশিব ও অন্যান্যদের নিয়ে পলায়ন করেন। তাঁরা আশ্রয় নিলেন পেনুকোন্ডায়।

বিজিত মুসলমানেরা তেত্রিশ বর্গকিলোমিটারের উপর বিস্তৃত রাজধানী হাম্পির সমস্ত সম্পদ যথেচ্ছ লুণ্ঠন করতে থাকে। কথিত আছে যে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে সেই লুঠতরাজ চলে। সমৃদ্ধ রাজধানী একটি মাত্র যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আপাদমস্তক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায়। এই বিপর্যয় থেকে হাম্পি আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি কোনদিন। একদিনের মুখর রাজধানী জনশূন্য প্রান্তর হয়ে পড়ে রইল তখন থেকে।

সামগ্রিকভাবে বিজয়নগর বংশের রাজত্বকাল ১৩৩৬ থেকে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দুশ' ত্রিশ বছর ধরে। পরে অবশ্য আরো কিছুকাল রাজত্ব করেন পরবর্তী রাজারা। তবে অতীত গৌরব বজায় ছিল যৎসামান্য। নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল প্রথমে চন্দ্রগিরিতে (১৫৮৫ সালে), পরে ১৬০৪ সাল থেকে ভেলোরে। তৃতীয় শ্রীরঙ্গ (১৬৪২-১৬৪৯ খৃঃ) ছিলেন গৌরবহীন বিজয়নগর বংশের শেষ রাজা।

তালিকোটার যুদ্ধের পরে রাজধানী বিজয়নগরের অধিকার চলে যায় বিজাপুর-গোলকুণ্ডার হাতে। ১৬৮৯ সালে রাজধানী দখল করলেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। ১৭০৭ সালে দখল করে হায়দ্রাবাদের নিজাম। ১৭৮০ সালে হায়দার আলি। তারপর গোটা দেশটাই তো চলে যায় বৃটিশ দখলদারদের হাতে। আমরা যেমন একদা যৌথভাবে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই না করে তুর্কি-আফগানিদের হাতে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের ভার তুলে দিয়েছি, তেমনি সাগরপার থেকে আসা মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের হাতেও দেশের ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

উত্তর ভারতে যখন মুসলমান সম্রাট এবং দ(িণেও ত্র(মশ তুর্কী-আফগানি শাসন প্রসারিত হচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে দ(িণ ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য ছিল এই বিজয়নগর। সিটি অব ভিকট্রি — এই নামটাই বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। বিদ্যানগর নয়।

সমুদ্রতল থেকে মাত্র ৪৬৭ মিটার উঁচুতে অবস্থান। একগুচ্ছ পাহাড়ী টিলার উপরে। পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী। নদীর এপারেও পাহাড়। তুঙ্গভদ্রা নদীর দুধারে ছড়ানো রয়েছে রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। হাম্পিতে তারই কিয়দংশ পর্যটকদের দ্রষ্টব্য বিষয়। নদীর দ(িণ তীরেই অধিকাংশ দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি ছড়িয়ে রয়েছে — রাজপ্রাসাদ, বিরূপা(মন্দির, বিঠালা মন্দির ইত্যাদি। ইউনেস্কোর ওয়ার্লড হেরিটেজ সেন্টার হিসেবে হাম্পির ঐশ্বর্য বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

চিত্র-৭৩। হাম্পি-১।

৬ই আগস্ট, বুধবার। সকালের বাসে হাম্পি যাচ্ছি।

হসপেট থেকে ১৯ কিলোমিটার রাস্তা। মাঠ ঘাট গ্রাম-গঞ্জ ছাড়িয়ে লোকাল বাস যাচ্ছে। তেমন ভিড় ছিল না বাসে। সুন্দর মন্দির চত্বর পড়ল পথে। তারপর পাহাড়ের চড়াই শু(করল। আমরা হাম্পি পাহাড়ের উপরে উঠলাম।

চিত্র-৭৪। হাম্পি-২।

বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই ছড়ানো চারদিকে। রাশি রাশি পাথরের উপর আরো পাথর চেপে রয়েছে। দূরে উঁচু পাহাড়চূড়ো দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে সবুজ গাছপালায় স্নিগ্ধ। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ এই বিশাল উপত্যকায় ছড়ানো। বাস এসে থামল হাম্পি বাজারের কাছে। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই একদল মানুষ ছুটে এল। এরা গাইড এবং অটো-চালক।

চিত্র-৭৫। হাম্পি-৩।

বললাম — গাইড চাই কিন্তু অটো কেন?

ওরা বলল — এতবড়ো এলাকা একদিনে

পায়ে হেঁটে দেখা সম্ভব নয়। এর জন্য অটো ভাড়া করতে হবে আপনাকে। সঙ্গে নিতে হবে গাইড।

– গাইড-চার্জ কত পড়বে?

– তিনশ' টাকা।

বলে কী! তিনশ' টাকা! এত বেশি গাইডচার্জ হতে পারে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। গাইডই যদি এই দর হাঁকে, অটো বোধহয় চারশ' টাকা চাইবে। তত(ণে প্রমাদ গুণছি – তার মানে তো সাতশ' টাকার ধাক্কা! এত মূল্যবান পরিষেবা আমাদের মতো ছাপোষাদের প(হজম করা মুস্কিল। সুতরাং কেটে পড়া দরকার। হাম্পির একখানা ট্যুরিস্ট ম্যাপ সঙ্গে ছিল। সেটাই ভরসা।

চিত্র-৭৬। হাম্পির পর্যটন মানচিত্র।

হবু গাইডকে বললাম – না ভাই, গাইড চাই না।

একথা বলে দু'জনে বিরূপা(মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম। তবে কালো গাট্টাগোট্টা এক যুবক কিন্তু আমাদের পিছনে লেগে রইল। আমরা বিরূপা(মন্দিরে যাচ্ছি, সেও সঙ্গে সঙ্গে সেঁটে আছে। বলল – আমার বাড়ি হসপেটে। আপনাদের সঙ্গে এক বাসেই এসেছি।

– তো?

– আমি গাইডের কাজ করি। আমাকে দেড়শ' টাকা দিলেই হবে।

শেষ পর্যন্ত তার অধ্যাবসায়ের কাছে পরাস্ত হয়ে তাকে মনোনীত করলাম। এক গাল হেসে ঝুরিঝুরি ভরসা দিল যে যথাসম্ভব বিশদে ও বিস্তারে আমাদের হাম্পি দর্শন করাবে। নাম জিজ্ঞাসা করতে বলল – তুল্লাহাল্লি মাট্টা জাথায়া।

তখনও আমরা জানি না যে আসলে আমরাই একদিনে এত কিছু দর্শনীয় বস্তু দেখে উঠতে পারব না। হাম্পি দেখতে হলে কমপ(দুটো দিন তো চাইই, তিনটে দিন হলেই যেন ভালো হয়। তাহলে হসপেট না থেকে হাম্পিতে থাকলেই ভালো হত। দু'বেলা মৌজ করে ঘুরে বেড়ানো যেত। সেটা করা হয়নি বলে আপশোষ হচ্ছিল।

জাথায়া আমাদের নিয়ে চলল বিরূপা(মন্দিরের দিকে। এলাকার নাম হাম্পি বাজার। দু'পাশে সারি দিয়ে বসেছে নানা দোকানপাট। চা-জলখাবারের দোকান, স্যুভেনিরের দোকান। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পর্যটক পেজ বিজয়নগর ভ্রমণে এসে বিরূপা(মন্দির প্রায় পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখে গিয়েছিলেন। চারশ' তিরাশি বছর পরে দেখতে এসেছি আমরা দুই বঙ্গবাসী।

সপ্তম শতকে নির্মিত পম্পাপতী বা বিরূপা(মন্দির। সাধারণের কাছে বিরূপা(নামটাই বেশি প্রচলিত। পম্পাও এখানে পার্বতী নয়, ব্রহ্মার কন্যা। পম্পাপতির অর্থ কন্যা পম্পার পতি বা পম্পা-তীর্থের অধী(র। নদীর দ(ণ তীরে হেমকূট পর্বতের উত্তরে নির্মিত বিশাল বিরূপা(মন্দির এলাকা প্রাচীরবেষ্টিত। দুটি চত্বরে বিভক্ত(।

চিত্র-৭৭। গোপুরম, বিরূপা(মন্দির।

চত্বরের পূর্বদিকে বিশাল ন'তলা গোপুরের তলা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ-তোরণের উচ্চতা একশ' সত্তর ফুট। সম্ভবত নির্মাণ করেছেন দ্বিতীয় দেবরায়ের (১৪২২-

৪৬ খৃঃ) কর্মচারী বা সেনানায়ক প্রোলুগান্তি টিপ্পা। পরে কৃষ(দেব রায় এর সংস্কার করেন। গোপুর পেরিয়ে পৌঁছলাম বহিঃচত্বরে। তারপর আরেকটি তিনতলা গোপুর দেখা যাচ্ছে। সেটা পেরিয়ে ভিতরের চত্বরে প্রবেশ করতে হবে। দ্বিতীয় গোপুরটি নির্মাণ করেছেন কৃষ(দেব রায়।

বাইরের চত্বরটি দৈর্ঘ্যে ৭৮ মিটার ও প্রস্থে ৫১ মিটার। অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে এবং বেশ কিছু মণ্ডপও। তার মধ্যে দু'টি মণ্ডপ হল ফলপূজা মণ্ডপ। রয়েছে উত্তর-পশ্চিমে ও দ(ণ-পশ্চিমে। একটি নালা দেখিয়ে জাথায়া বলল — এই যে নালা দেখছেন, এর জল নিয়ে আসা হত তুঙ্গভদ্রা থেকে। নালাটি মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে পাকশালা হয়ে বাইরের চত্বর দিয়ে বয়ে যেত। অথচ নদীর জলতল অনেক নিচে। বলুন তো, চমৎকার ব্যাপার নয়?

বললাম — হ্যাঁ তা বটে, তবে একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। এমনি এমনি নিচের জল উপরে উঠে আসতে পারে না।

কথাটা জাথায়ার পছন্দ হল না। প্রাঙ্গণে হাতী বাঁধা রয়েছে। নাম ভুবনে(শ্বরী। বয়োবৃদ্ধা ঐরাবতটি পর্যটকদের দর্শনী-প্রার্থী। চত্বরে বেশ কয়েকটি দোকানপাট রয়েছে। পূজার সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। জুতো জমা রেখে ভিতরের চত্বরে প্রবেশ করলাম।

চিত্র-৭৮। বিরূপা(মন্দির।

বিশাল চত্বর। মধ্যিখানে মূলমন্দির এবং চারপাশে আরো অনেক মণ্ডপ ও দেবপীঠ।

চিত্র-৭৯। মহামণ্ডপ, বিরূপা(মন্দির।

মূলমন্দির পূর্বমুখী। গর্ভগৃহের সামনে রয়েছে অন্ত রাল-অর্ধমণ্ড প-মহামণ্ড প। উৎকীর্ণ-শিলালিপিতে মহামণ্ডপকে রঙ্গমণ্ডপ বলা হয়েছে। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে রঙ্গমণ্ডপখানি রাজা কৃষ(দেবরায় নির্মাণ করেন। গর্ভগৃহটি ত্রিতল, অন্যান্য মণ্ডপ একতলা।

মহামণ্ডপ পাঁচটি লম্বা সারিতে (আইল) বিভক্ত(— নানা প্রকার স্তম্ভের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভগুলি সরল চৌকোণা নয় - যুক্ত(হয়েছে বাড়তি কা(কার্যময় অঙ্গ। একে কম্পোজিট পিলার বলা হয়। মণ্ডপের ঠিক মাঝখানের আয়ত(ত্রটি

ষোলোটি স্তম্ভের উপর। সজ্জিত হয়েছে স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত('র‍্যাম্পান্ট বলি' দিয়ে। 'বলি' আসলে পৌরাণিক সিংহের কাল্পনিক রূপ। কেশর-নখর-লেজ আছে, বিস্ফারিত চ(ও শাণিত দাঁত আছে, হাতির মতো শুঁড়ও আছে। দু'পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান। মুখ থেকে শৃঙ্খল ঝুলছে, পায়ের নিচে মকর এবং পিঠের উপর সওয়ারী। অন্যত্র একে ভয়াল বলা হয়েছে। ভিতরের লাইনে দু'টি স্তম্ভে অগভীর খোদাইয়ে মন্দিররাজি উৎকীর্ণ। বাইরের দিকের স্তম্ভের সঙ্গে জুড়ে আছে একগুচ্ছ করে এক-দেড় হাতের ছোট ছোট স(থাম (পিলারেট)।

চিত্র-৮০। ভয়াল।

চিত্র-৮১। মণ্ডপের স্তম্ভ।

রঙ্গমণ্ডপের সামনের দিকে কপোটার উপরে পাঁচটি কুলুঙ্গি, উপরে কর্ণকূট, ভদ্রশালা ও পঞ্জর। কুলুঙ্গির মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

মণ্ডপের কেন্দ্রীয় সারি একটু বেশি উঁচু। সিলিংয়ে গভীর করে শতদল খোদাই করা হয়েছে। কিছু প্যানেলে রঙিন চিত্রাঙ্কন আছে। এই সব চিত্র নাকি পরবর্তী কালের সংযোজন। হয়তো প্রাচীন চিত্রকলার উপরে নতুন করে চিত্ররচনা হয়েছে বলে এমনটা মনে হচ্ছে। নানা কাহিনী ব্যক্ত(হয়েছে চিত্রাবলিতে — বিদ্যারণ্যের শোভাযাত্রা, অর্জুনের ল(্যভেদ, দশাবতার, দিকপালগণ, কামদহনমূর্তি রূপে শিব, ত্রিপুরারী এবং কল্যাণসুন্দর। পম্পা-বিরূপা(র বিবাহ, রাম-সীতার বিবাহও চিত্রিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সারির চারদিকের কড়িতেও দেখছি খোদাই-করা ফ্রিজ।

রঙ্গমণ্ডপের পশ্চিমে অর্ধমণ্ডপ। প্রবেশদ্বারের দু'পাশে গ্রানাইট পাথরে তৈরী চমৎকার দুই দ্বারপাল। চতুর্ভুজ মূর্তিদুটি ন' ফুট উচ্চতার। মণ্ডপের

চিত্র-৮২। একটি ফ্রিজ, বিরূপা(মন্দির।

বাইরের দেয়ালে বাস-রিলিফে নানা চিত্র-কাহিনী। মধ্যের সিলিংয়ে শতদল। গর্ভগৃহ ঘিরে রয়েছে অপ্রশস্ত প্রদ(িণ প্রাকার। দেবতাকে প্রদ(িণ করলুম চারপাশটা দেখার জন্যে। ফুলের ডালি সাজিয়ে পূজো করা হয়নি। নিবেদন করা হয়েছে শ্রদ্ধা-ভক্তি(।

পবিত্র দেবালয়ের বিমান ত্রিতল। উপরে বর্গাকার (েত্রের উপর গম্বুজাকৃতি শিখরদেশ। মাঝখানে বড়ো স্তূপি আর চারকোণায় চারটি ছোট স্তূপি শোভা পাচ্ছে। ১৫০৯ সালে রাজা কৃষ(দেব রায়ের রাজ্যাভিষেক হয়। স্মারক হিসেবে একখণ্ড পাথর কুঁদে বড়ো আকারের বিরূপা(লিঙ্গমূর্তি রূপ পেয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহে। আছেন দেবী পম্পা। ইনি কি পার্বতী না ব্রহ্মা-নন্দিনী, জাথায়ার ভাষ্য থেকে ঠিক ধরা গেল না। সঙ্গে আরেক দেবী আছেন — ভুবনে(েরী।

চিত্র-৮৩। ভাস্কর্য, বিরূপা(মন্দির।

ভিতরের চত্বর ঘিরে অনেক দেবালয় দেখছি। মুক্তি(-নরসিংহ, পাতালে(েরর এবং নবদুর্গা। আছে সূর্যনারায়ণ মন্দির। তারকে(েরর বিগ্রহে শিবের কোলে পার্বতী উপবিষ্টা। দ(িণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে সরস্বতী মন্দির। চালুক্য রীতিতে নির্মিত হয়েছে কালো পাথরের বীণাবাদনরতা দেবী সরস্বতীর অপরূপা মূর্তি। বিগ্রহের পশ্চাদপট জুড়ে আছে পাথরের সূক্ষ্ম জালিকাজ — প্রভাবলী। মূর্তিটিকে অসাধারণ ভাস্কর্য বলে মনে হল।

পশ্চিম দিকের করিডোরে দেখছি কালো পাথরের মহিষাসুরমর্দিনী। দেবী এখানে ষড়ভুজা। কালের (য়ে মূর্তিটি ভীষণভাবে (তিগ্রস্ত। করিডোরের পিছনে আছে বিদ্যারণ্যকে উৎসগ করা একটি মন্দির। নির্মাতা দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭-১৪০৪খৃঃ)। তবে বিগ্রহটি নতুন।

উত্তর করিডোরে রয়েছে সুপ্রাচীন পার্বতী ও ভুবনে(েরী মন্দির। দা(ণ সুন্দর কাজকরা কালো পাথরের স্তম্ভ আছে মন্দিরে। হাল আমলের লেদে-কাটা বলে মনে হয়। সিলিং কা(কার্যময়। দরজায় চওড়া বাজু। তাতে এফোড়ওফোড় করা সূক্ষ্ম জালিকাজ। এসব শিল্পরীতি পরবর্তী চালুক্য আমলের বৈশিষ্ট্য। তাই মন্দিরের নির্মাণকাল দ্বাদশ শতকের ধরা হচ্ছে।

জাথায়া এক জায়গায় পাথরের ছিদ্র দেখিয়ে বলল — দেখুন, তখনকার পিনহোল ক্যামেরায় ওদিককার বড়ো গোপুরমের কেমন উল্টো প্রতিবিম্ব পড়ে ভিতরের দেয়ালে।

বিরূপা(মন্দিরের উত্তরদিকে আরেকটি গোপুর রয়েছে। পঞ্চতল কানগিরি গোপুর। তা দিয়ে উত্তরদিকে এগোলে পড়বে তুঙ্গভদ্রা নদী। আমরা বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলাম রামায়ণ-খ্যাত পম্পানদী দেখতে। মহাকবি বাল্মীকির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই

হাল আমলের নদীটিকে। সেকথা জাথায়াকে বলতেই, ও জানাল — আমরা সেদিকেই তো যাচ্ছি।

চলার পথে প্রথমে পড়ল মন্মথ গুণ্ডম নামের এক সবুজে পুকুর। জাথায়ার ভাষায় লোকপাবন সরোবর। পরে জেনেছি লোকপাবন নামে আরেকটি জায়গা আছে পট্টভিরাম মন্দিরের কাছে। জাথায়া সঠিক তথ্য জানাতে পারেনি মনে হচ্ছে।

সরোবর ঘিরে গোটা কুড়ি মন্দির রয়েছে। বেশির ভাগই ধ্বংসস্তূপ। একটি মন্দির একটু আলাদা মনে হল। নাম দুর্গা মন্দির অথবা চামুণ্ডে(েরী মন্দির। গর্ভগৃহ-অন্তরালের বাইরে মুক্ত(অর্ধমণ্ডপ রয়েছে। ত্রিতল বিমান। মন্দিরের ক(ণ দশা। দণ্ডায়মান দেবী এখানে অষ্টভুজা, দীর্ঘ করণ্ডমুকুটে শোভিতা। তাঁর কানে বড়োসরো বলয়কুণ্ডল, ডানহাতে চক্র(-তীর-খড়্গ ও শূল আর বাম হাতে শঙ্খ, ধনু ও গোলাকার খেটক (ঢাল)। শূল দিয়ে মহিষাসুরকে আঘাত করছেন এবং বাম হাতে মহিষাসুরের জিহ্বা আকর্ষণ করছেন। দেবীর অধরে হাসি। এক পা ভূমিতে, অন্য পা মহিষের পিঠে। পাশে বাহন সিংহ। মূর্তির রূপকল্প অভিনব। অর্ধমণ্ডপের দেয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে কুন্তল দেশের কু(গোড়ু প্রধানের পত্নী হাম্পির বিরূপা(মন্দির-চত্বরে দুর্গামন্দিরটি নির্মাণ করেছেন।

বিগ্রহের শিল্পরীতি থেকে পণ্ডিতবর্গের অনুমান মূর্তিটি আরো প্রাচীন — বোধহয় নবম-দশম শতকের।

আরেকটু সামনে এগিয়ে পড়ল তুঙ্গভদ্রা। জল আছে সামান্য। নদী বলার মতো নয়। উজানে নদীবাঁধ প্রকল্প হয়েছে। ফলে নিম্নপ্রবাহে প্রবাহের বারোটা বেজে গিয়েছে। নদীর বুকে ইতস্তত প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো। ঘাট থেকে অনেক নিচে জল। না, কবি বাল্মিকীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। কিছুই মেলে না। মিলবে কী করে? একে তো কবি-কল্পনা, তার উপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। সবই তো বদলে গিয়েছে। একেবারে ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। ছিলই বা কবে!

নদীর হতাশা সঙ্গে করে ফিরে চললাম। জুতো পড়তে পড়তে জাথায়াকে বললাম — অটো কি নিতেই হবে?

— না নিলে আপনি এতটা জায়গা পায়ে হেঁটে ঘুরতে পারবেন না।

— ওরা যে বড্ড বেশি দর হাঁকছিল।

— আমি দেখব? শ'দুয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে।

মন্দিরের দিকে মুখ করে আছে হাম্পি বাজার। ফিরে এলাম সেখানে। জাথায়া জানিয়ে রাখল — পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া এই সড়কটি প্রায় ২৪০০ ফুট দীর্ঘ। প্রাচীন রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ছিল এই বাজার। তারই পশ্চিমে সুবিশাল বিরূপা(মন্দির।

মন্দিরের দ(িণে উঁচুতে উঠে গিয়েছে হেমকূট পাহাড়। বাঁহাতে ঘুরে উপরের দিকে উঠতে হবে। ছুট পায়ে ওঠার চেষ্টা করতে হাঁপ ধরে গেল। সামান্য চড়াই। তবু। দেহে বার্ধক্যের কামড় বসছে — টের পাচ্ছি। মাঝে মাঝে সেটা ভুলে যাওয়ার বাসনা কেন হয় কে জানে!

হেমকূট পাহাড়ের উত্তরের ঢলে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। গঠনবৈচিত্র্য একেবারে অন্যরকমের। একটি প্রবেশ তোরণ দেখতে পাচ্ছি। রোদের তেজ মন্দ নয়। দম নেবার জন্য তোরণের ছায়ায় বসেছি। সামনে বাঁদিকে বিরূপা(মন্দিরের গোপুরম এবং বিমান দেখা যাচ্ছে। তারপরে পম্পা নদী। নদীর ওপারে আবার পাহাড়। পুরো দিকচত্র(বাল জুড়ে। এখানকার পাহাড়ে ঢাউস পাথরের চাঁই কে যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে এলোমেলো জমা করে রেখেছে কে জান!

সামনে ও ডানদিকে এখানে যে সকল মন্দির দেখা যাচ্ছে তাদের শিখরদেশ ধাপে ধাপে উপরে ওঠা পিরামিডের মতো। উপরে বর্গাকার গম্বুজের মতো শিখরচূড়া। মন্দির উত্তরাভিমুখী এবং ত্রিকূটাচল ধরনের। ত্রিকূটাচল বলতে, একই অধিষ্ঠানের উপর পাশাপাশি তিনটি শিখর নিয়ে থ্রি-ইন-ওয়ান মন্দির। পূর্ব-, পশ্চিম- এবং উত্তর-মুখী তিনটি বিমানের সামনে একটি সাধারণ অর্ধমণ্ডপ এবং একটি মুখমণ্ডপ বা অলিন্দ। তিন বিমানের তিনটি চূড়ো। ন-দশটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। এবং অধিকাংশই শৈবমন্দির।

চিত্র-৮৪। হেমকূট পাহাড়ের ত্রিকূটাচল মন্দির।

মোটামুটি সাতটি মন্দির চিহ্নি(ত করা গিয়েছে। দ্বিতীয় মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় 'মুম্মদি সিঙ্গেয় নায়কের পুত্র বীর কম্পিলদেব এই শিবালয় নির্মাণ করে তিন শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন'। এই কম্পিলদেবের অধীনেই সম্ভবত হরিহর-বুক্কা কর্মরত ছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে — ১৩০৩ থেকে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাহলে এই মন্দির অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন। পাশের মন্দিরটি ত্রিতল এবং সবেথেকে বেশি অলঙ্কৃত।

নৃত্যরত গণেশ ও দেবীমূর্তি আছে। গণেশ-মূর্তিই বেশি। সেজন্যে এটি গণেশ মন্দির বলে বিবেচিত। উত্তরের দিকে আরো তিনটি ছোট মন্দির আছে। তার মধ্যে দুটি দুই-

বিমানের। এবং একটি নবম-দশম শতকের। শেষের মন্দিরটি আবার ত্রিকূটাচল ধরণের এবং অষ্টতল। নির্মাণশৈলী থেকে ঐতিহাসিকেরা মন্দিরগুচ্ছের কালনির্ণয় করেছেন — নবম থেকে চতুর্দশ শতক। তার মানে হাম্পির প্রাচীনতম নির্মাণের স্বা(র রয়েছে এখানে।

দ(িণ দিশায় অনতিদূরে রয়েছে কয়েকটি ছোট মন্দির। পূর্বমুখী প্রসন্ন বা মূল-বিরূপা(মন্দির। আজো পূজো হয়। প্রসন্ন অঞ্জনেয় মন্দিরে বড়ো মূর্তি রয়েছে। পাশে পুকুর। সেখানে প্রাপ্ত দুটি শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে, ১৩৯৮ সালে বিরূপা(পণ্ডিত ও তাঁর ভাই (প্রসন্ন?) বিরূপা(মন্দির নির্মাণ করেন ও পাশে পুষ্করিনী খনন করেন। আশেপাশে আরো লিঙ্গমূর্তি খোদাই করা রয়েছে। একটি প্রস্তরে ১৩৯৭ সালে দ্বিতীয় হরিহরের রানি বুক্কায়াভ কর্তৃক নির্মিত জেডেয় শঙ্করদেবের মন্দিরে দীপস্তম্ভ নির্মাণের কথা খোদিত আছে।

ঝলমলে আকাশ। টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে। বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল খুব। কিন্তু এখনো জ্বালায়নি আমাদের। বরঞ্চ ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। পাহাড় তেতে রয়েছে। বেশি(ণ ঘোরাঘুরি করা যাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। নেমে এলাম হাম্পি বাজারে। আগে একটু চা-পান করতে হবে। চিনি-বর্জিত লিকার হলেই ভালো হয়। হঠাৎ খেয়াল হল একখানা বই ফেলে এসেছি। নিশ্চয়ই হেমকূট পাহাড়ে যেখানে বসেছিলাম, সেখানে ফেলে এসেছি। জাথায়া বলল — ভয় নেই পেয়ে যাবেন। আস্তে আস্তে যান।

চিত্র-৮৫। হেমকূট পাহাড়ের একটি প্রস্তরখণ্ডে।

প্রায় দৌড়ে চলে গেলাম উপরে। ঠিকই ভাবা হয়েছিল। তোরণদ্বারে বসেছিলাম যেখানে, ওখানেই পেয়ে গেলাম বইখানা। নেমে এসে বাজারের দোকানে বসে চা-বিস্কুট খেলাম। উল্টোদিকে কর্ণাটক পর্যটন দপ্তরের অফিস। বন্ধ রয়েছে। অটোভাড়া করতেই হবে মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে গাইডের উপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। জাথায়াকে বললাম — আমরা আর কাকে ভালো-মন্দ বলে চিনব। তুমিই চেনাজানা কোন অটো ধরে নিয়ে এস।

জাথায়া ভাড়া করে নিয়ে এল রামপ্রসাদ হনুমানের অটো।

১০। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ

অটোয় চড়ে প্রথমে গেলাম হেমকূট পর্বতের অন্য দিকে গণেশমূর্তি দেখতে। গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে পায়ে হেঁটে যেতে হয়।

বিশাল গণেশ মূর্তি — আট ফুট উঁচু। একশিলায় নির্মিত। রহস্য করে বলা হচ্ছে, সসিবেকালু গণেশ, মানে সর্ষেদানার মতো গণেশ। চতুর্ভুজ দেবতার হাতে অঙ্কুশ, পাশ এবং ভাঙা হস্তিদন্ত। মূর্তির একটি হাত ও শুঁড় ভাঙা। তা না হলে এই শুঁড় লাড্ডুভাণ্ডের ঘ্রাণ আস্বাদনে উদগ্রীব থাকত।

চিত্র-৮৬। সসিবেকালু গণেশ।

ভারতী বলল — গণেশদাদার পেটটি চিরকালই নাদা।

আমরা ঘুরেফিরে মন্দির দেখছি। হঠাৎ কোত্থেকে একজন উর্দিধারী সিক্যুরিটি স্টাফ এসে জাথায়াকে ধমকাতে শু(করল। ব্যাপারখানা কী! গাইড আবার কি গণ্ডগোল করল? শাস্ত্রীমশাই কঠিন গলায় বলছে জাথায়াকে — ইয়ে মেরা ঘরকা আদমি হ্যায়। ইনকো কোই তকলিফ মত দেনা। সব ঠিকঠাক সমঝানা। উল্টাসিধা কুছ না কহনা।

আর জাথায়া দেখছি বিগলিত হয়ে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। কোন প্রকার পাপকর্ম করবে না বলে দরাজ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ইত্যাকার প্রতিশ্রুতির বন্যা সচরাচর রাজনীতিতেই হয়ে থাকে। কেননা তা পালনের প্রয়োজন নেই।

ভাবছি শাস্ত্রীমশাই তাহলে কি নিখাঁদ বাঙালি হবেন? মাতৃভাষায় আমাদের কথা বলতে শুনে আকৃষ্ট হয়ে অযাজিত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলুম — আপনি কি বাঙালি?

— না, বাঙালি নয়, তবে ওদিককারই লোক। ঝাড়খণ্ডের।

ঝাড়খণ্ড তো পশ্চিমবাংলার অংশ নয়। তবু ইনি যখন বঙ্গভাষীর প্রতি এমন উদারতা দেখাচ্ছেন, তখন হৃদয়খানি গৌরবে প্রসারিত হয়ে গেল। বললাম — ঝাড়খণ্ড, সে তো প্রায় আমাদের দেশের লোকই হল। খুব ভালো লাগল আপনার কথা শুনে।

— আমি ক্যালকাটা জানি। ওদিকে সার্ভিস করেছি ডায়মণ্ডহারবারে অউর টিটাগড়ে। ক্যালকাটা জানি, মাদার কালির কালিঘাট জানি। সানন্দে জানাতে লাগল।

ভদ্রলোকের কালো পেটাই চেহারা। মাঝারি উচ্চতা। নাম জয়সিং বোদরা। ঝাড়খণ্ডের

লোক হয়েও আমাদের মতো নিপাট বঙ্গজদের নিজেদের দেশের লোকবলে মনে করছে। এমন অভিজ্ঞতা হয়নি কখনো। আজকাল সব প্রদেশের লোকই কিঞ্চিৎ প্রাদেশিক জাতীয়তাবোধে আত্র(ান্ত। তাই বাঙাল খেদাও, ওড়িয়া খেদাও টাইপের আন্দোলন-মারামারি চলে। এক দেশের ছত্রছায়ায় বাস করেও যখন ভারতীয়তা-বোধ ক্লিষ্ট, তখন কাউকে এমন উদারতায় উজ্জীবিত দেখলে ভালোই লাগে। অফিসারকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম ও শুভেচ্ছা কামনা করলাম। বোদরা আমাদের অভিভূত করে বিদায় নিল।

সসিবেকালু গণেশের পাশেই আরেকটি গণেশ মূর্তি রয়েছে। আরো বড়ো মূর্তি, পনেরো ফুট উঁচু। নাম কডলেকালু গণেশ। অর্থাৎ ছোলার দানার মতো গণেশ। এও মজা করে দেওয়া নাম। জাথায়া এবার নতুন উদ্যমে ব্যাখ্যা করতে শু(করল — বিশাল এক বোল্ডার কেটে এই মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। এই দেখুন মন্দিরের সামনের মণ্ডপ এবং পিলার।

চিত্র-৮৭। কডলেকালু গণেশ মন্দির।

মন্দির দেখে বেরিয়ে যেতে যেতে বোদরার কথাই বলাবলি করছি। হসপেটে গতকাল দেখা হয়েছিল হায়দ্রাবাদী ওঝার সঙ্গে। আজ ঝাড়খণ্ডের বোদরার সঙ্গে। কী রকম গায়ে পড়ে আলাপ হয়ে যাচ্ছে ভিনদেশের লোকজনের সঙ্গে। বঙ্গদেশ থেকে আমরা অনেক দূরে। দেশের মধ্যে থেকেও বিদেশে। তবু এখানে আ-মরি বাংলাভাষা আমাদের পিছু ছাড়েনি। এ অভিজ্ঞতা ভ্রমণের অন্য স্বাদ এনে দিল।

চিত্র-৮৮। বোদরার সঙ্গে।

অটোয় উঠতে যাব বলে রাস্তায় নেমেছি। দেখা হয়ে গেল বোদরার সঙ্গে। বলল — নিন ডাব খান।

— তা খাওয়া যাক।

ডাবওয়ালা চারজনকে ডাব কেটে দিল। মিষ্টিজল পান করে ভালোই লাগল। দাম জিজ্ঞেস করে টাকা বার করছি, বোদরাজি বলল ডাব-বিত্রে(তাকে — উনসে (পেয়া মত লেনা।

ব্যস, সে লোকটা আর আমার কাছ থেকে দাম নেবে না। এ তো মহা মুস্কিল হল। অনেক সাধাসাধি করেও ব্যর্থ হলাম। কী আর করা! আবার কয়েক প্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে অটোয় চড়ে বসলাম। পথেঘাটে এমন মানুষজনের দেখাও মেলে! তবে তো পৃথিবীটা শুধু স্বার্থসর্বস্ব মনুষ্যরূপী পশুতে ভরে যায়নি!

হাম্পি এলাকায় পাঁচটি গ্রাম আছে। হাম্পি বা পম্পাপুরম, কৃষ(াপুরম, কমলাপুরম, নিম্বুপুরম বা বিঠালাপুরম এবং ভেঙ্কটাপুরম। আমরা হাম্পি থেকে কৃষ(াপুরম এলাকায় প্রবেশ করেছি।

চিত্র-৮৯। গোপুরম, কৃষ(মন্দির।

গাড়ি থামল কৃষ(মন্দিরে। জাথায়া বলল — এর নাম হরেবট্ট কৃষ(মন্দির। শিলালিপি অনুসারে কৃষ(দেব রায় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার উদয়গিরি থেকে বালকৃষ(মূর্তি এনে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির নির্মিত হয় উড়িষ্যা অভিযানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে।

প্রাকার বেষ্টিত প্রাঙ্গন। পূর্বদিকের গোপুরে অনেক উজ্জীবিত অ(ে-হস্তীর স্টাকো-মূর্তি। সঙ্গে ঢাল-তরোয়াল সহ যোদ্ধার দল। কৃষ(দেব রায়ের উড়িষ্যা যুদ্ধের কাহিনী বিধৃত হয়েছে হয়তো।

চিত্র-৯০। কৃষ(মন্দির।

ভিতরে স্বামী-মন্দিরের সঙ্গে আম্মান (মাতৃ)-মন্দির আছে। বিজয়নগরের বিশিষ্ট স্টাইলে। পুবের তিনদিকে খোলা বর্গাকার মহামণ্ডপ। ছয় সারি করে স্তম্ভ এক একদিকে। উত্তর-দ(ণে সিঁড়ি। সামনে অলিন্দ। পশ্চিমদিকে অপে(াকৃত ছোট আকারের অর্ধমণ্ডপ। মধ্যে চারটি স্তম্ভ। একটি স্তম্ভে দশাবতার মূর্তি খোদিত। এমনকি অ(েমুখী কল্কি অবতারও আছে সেখানে — উপবিষ্ট অবস্থায়। কল্কির মূর্তি দুর্লভ। কলিকালের উদ্ধারে কল্কির আবির্ভাব হওয়ার কথা। তাঁর স্বরূপ কেমন হবে তা পুরাণে ব্যত্ত(হয়েছে। এদিকে কলিকাল শুনছি অনেকদিন ধরেই চলে আসছে, কিন্তু কল্কির আবির্ভাব হল না

চিত্র-৯১। কৃষ(মন্দির।

এখনো। কবে হবে তার কোন হদিশ নেই। ইতিমধ্যে বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব, রামকৃষ(এমন আরো অনেকে এসেছেন। কলির উদ্ধার হয়নি। আচ্ছা, কল্কি কি শুধু ভারত-উদ্ধারে আবির্ভূত হবেন নাকি গোটা বি(ে-উদ্ধারে?

অর্ধমণ্ডপের উত্তর-দ(ণে খোলা বারান্দা ও সিঁড়ি। তারপর গর্ভগৃহ-অন্তরাল এবং তাদের বেষ্টন করে প্রদ(ণপথ। গর্ভগৃহ-অন্তরালের দেয়ালে চমৎকার বাস-রিলিফের কাজ ল(্য করা যায়। ইঁট-প-াস্টারে নির্মিত মূলমন্দিরের বিমান — ত্রিতল। গোলাকার শিখরসহ।

স্বামী-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে আম্মান-মন্দির। ময়ূর বাহন সুব্রহ্মণ্যর মন্দির আছে দ(ণে। কৃষ(মন্দিরে সুব্রহ্মণ্য মন্দির থাকা নাকি আশ্চর্যজনক। তিনটি গোপুর আছে।

হরেবট্ট কৃষ(মন্দির দেখে গেলাম উগ্র নরসিংহমূর্তি দেখতে। কাছেই রয়েছে পাথরের বিশাল সেই বিখ্যাত উগ্রমূর্তি। দোতলা সমান উঁচু (২২ ফুট) মূর্তি । গ্রানাইট পাথরে একশিলায় খোদাই করা।

জাথায়া বলল — আসলে এটি লক্ষ্মী-নরসিংহ মূর্তি ছিল এবং লক্ষ্মীদেবী নরসিংহের বাম কোলে উপবিষ্টা ছিলেন। বর্তমানে লক্ষ্মীদেবী নেই। কেবল চতুর্ভুজ নরসিংহ পা ভাঁজ করে বসে রয়েছেন। দুই হাঁটু যুত্ত(রয়েছে পাথরের বেড় দিয়ে।

চিত্র-৯২। উগ্র নরসিংহ, হাম্পি।

নরসিংহদেবের মাথায় মুকুট। বিশালাকার চ(দুটি বিস্ফারিত, উগ্র মুখব্যাদান ভীতিপ্রদ। সিংহের কেশর অলঙ্কারের মতো শোভা পাচ্ছে। হাতদুটি ভাঙা। অঙ্গদ শোভিত ছিল বোঝা যাচ্ছে। ভাঙা পায়ে মল-পাঁয়জোর। সাত মাথাওয়ালা সাপের ফণার নিচে উপবিষ্ট। সামনে দুটি স্তম্ভের উপর মকরতোরণ, সাপের ফণার সঙ্গে যুত্ত(। তার উপরে আবার নরসিংহ-মুখ বা কীর্তিমুখ। উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, কৃষ(দেব রায় দ্বারা নির্মিত লক্ষ্মী-নরসিংহ মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য ১৫২৮ সালে তিনি অর্থমঞ্জুর করেছেন। হাম্পির অন্যতম আকর্ষণ এই উগ্র-নরসিংহ মূর্তি।

উগ্র-নরসিংহ মূর্তির দ(ণ-পূর্বে সরস্বতী মন্দির। আমরা না দেখে এড়িয়ে গেলাম। পথে পড়ল তু(ত্তু সেচ-নালা। নির্মাতা দ্বিতীয় বুক্ক। আরো দ(ণে চণ্ডিকে(র মন্দির। এটি বৈষ(ব মন্দির। বিপরীতে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় পরিচালিত উদ্যান বীরভদ্র মন্দিরে

চতুর্ভুজ বীরভদ্র তীর-ধনু ঢাল-খড়্গ নিয়ে আছেন। ইনি নিশ্চয়ই শিবানুচর বীরভদ্র। তাঁর দ(িণে (দ্রাকার দ(মূর্তি রয়েছে। দ(মানে পার্বতীর পিতৃদেব? দ(মূর্তিটি দর্শকদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। সর্বাঙ্গ-লিঙ্গ নামের এক লিঙ্গমূর্তিও রয়েছে। প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে দলভায়ি জঙ্গমায়া কর্তৃক নির্মিত হয়েছে মৃদু ভিরন্ন তথা বীরভদ্রের মন্দির।

যেতে যেতে পথে দেখা হল দুটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত আর্চ বা সিস্টার বোল্ডার। স্থানীয়দের কাছে অক্ক-টঙ্গিগুণ্ডু নামে খ্যাত। চারদিকেই যেন পাথরের স্তূপ ছড়ানো ছিটোনো। মনে হচ্ছে, মাটি-পাথরের পাহাড় থেকে মাটি ধুয়ে শুধু রাশি রাশি পাথর উন্মুক্ত(করে ফেলেছে।

চিত্র-৯৩। সিসটার বোলডার।

— এখন আমরা জেনানা মহল দেখতে যাব। আলাদা করে টিকিট কাটতে হবে। জাথায়া জানিয়ে রাখল।

অর্থাৎ আমরা এখন বিজয়নগরের রাজপুরীতে প্রবেশ করব।

ইতিহাস সা(্য দেয়, রাজধানী বিজয়নগর সুর(ার জন্য সাত সাতটি প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। সবচেয়ে দ(িণে প্রথম প্রাচীর — শু(হয়েছে হসপেটেরও তিন কিলোমিটার দ(িণে। দ্বিতীয় প্রাচীর হসপেটের ঠিক আগে এবং তৃতীয়টি শহরের মধ্য দিয়ে। হাম্পিতে সপ্তম নগরপ্রাকার রয়েছে কমলপুরের ঠিক উত্তরে। পূর্বদিকে মাল্যবন্ত পর্বত ও ভেঙ্কটপুর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। হাম্পিবাজার ও কৃষ(পুরম সপ্তম নগর প্রাকারের বাইরে। অনেকগুলো প্রাকার-দ্বার আছে তার — পূর্বে টালারিগাট্টু দ্বার, দ(িণে গম্বুজ দ্বার, ডরোজি দ্বার। সপ্তম নগর-প্রাকারের মধ্যে রাজমহলের জন্য একটি আলাদা প্রাকার ছিল। আজো তার কিছু নিদর্শন মেলে।

চিত্র-৯৪। পাতাল লিঙ্গে(র।

জেনানা মহলের একটু আগে পাতাল লিঙ্গে(র মন্দির। ভূমিতল থেকে অনেকটা নিচে মন্দির। বিশাল মহামণ্ডপ এবং ভিতরের অন্যান্য মণ্ডপ সবই জলময়। পরিত্যক্ত(চত্বরে চামচিকের বাসা। বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নেই।

পাশেই প্রাচীর-ঘেরা দানায়েক চত্বর। এটি রাজধানীর প্রশাসকের আস্তানা ছিল

নাকি। জেনানা মহলের সামনে এসে অটো থামল। আমরা হাম্পি বাজার থেকে তিন কিলোমিটার দ(িণে কমলাপুরম গ্রামের উত্তরে রাজাদের প্রাসাদপুরী এলাকায় এসে পড়েছি। টিকিট কেটে অন্দরমহলে প্রবেশ করলাম।

জেনানা মহল উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত এলাকায়। পশ্চিমের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। চারকোণা চত্বরের তিন কোনায় তিনটি ওয়াচ-টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। ডানহাতে জল-মহল। ইট দিয়ে বানানো জলাধারের মধ্যে এটি একটি প্যাভিলিয়ন। নিচের মোল্ডিং-করা বেসমেন্টের উপর মেঝে এবং ভিতরের কামরার আভাষ মেলে। উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে নারী-র(ীবাহিনীর কোয়ার্টার। অবশ্য সত্যি র(ীবাহিনীর বাসগৃহ ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারো কারো মতে এটি ছিল স্টোরহাউস বা ম্যাগাজিন।

পূর্বদিকে রানির প্রাসাদ। ভগ্ন প্রাসাদের তিন থাক অধিষ্ঠান-ভূমি মাত্র বিদ্যমান। দেয়াল-ছাদ কিছু নেই। আকারে অন্যান্য রাজকীয় প্রাসাদের থেকে বড়োই ছিল। অধিষ্ঠানে পশুপাখির চিত্র খোদাই করা। ছিটেফোটা রঙিন চিত্রাঙ্কন লেগে রয়েছে এখনো ভিতের উপর। অতীত গৌরবের সা(্য দিতে। কোন রানি নেই, কোন রাজকন্যা নেই, শুধু নামটা রয়েছে — রানির প্রাসাদ। একদা এখানে

চিত্র-৯৫। রানির প্রাসাদ।

চিত্র-৯৬। লোটাস মহল।

আতরের সুগন্ধ ছিল, রেশমের খসখসানি ছিল, ঘুঙুরের শব্দ ছিল, উচ্ছল কলহাস্য ছিল।

চত্বরের মাঝখানে বিখ্যাত লোটাস মহল বা চিত্রাগ্নি মহল। রাজধানীর প্রাসাদ বলতে একমাত্র এই মহলটিই মোটামুটি অ(ত অবস্থায় সেসময়কার নির্মাণশৈলীর পরিচয় বহন করছে। দ্বিতল মহল। মোল্ডিং করা ভিত। একতলা চারদিকে খোলা। দোতলা দেয়াল-ঘেরা। দুটো করে গবা(দেখা যাচ্ছে। নক্সা থেকে মনে হচ্ছে, মহলের কেন্দ্রে রয়েছে চারটি স্তম্ভ এবং তাকে ঘিরে বারোটি স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা বর্গাকার একখণ্ড জায়গা। প্রত্যেক পাশ থেকে চারদিকে প্রসারিত

হয়েছে টুকরো অলিন্দ। যেন ফুলের পাপড়ির মতো খুলে যাচ্ছে চারধারের আলো-বাতাসের দিকে। স্তম্ভসকল যুক্ত রয়েছে জ্যামিতিক নক্সা-কাটা খিলান-পথ (রিসেসড আর্চওয়ে) দিয়ে। উত্তর-পশ্চিম কোণায় দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি আছে। এখন তালাবন্ধ। চব্বিশটি চারকোণা থামের উপর দাঁড়ানো এই বাহারী মহল। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম — চতুষ্কোণ জমির প্রান্ত বরাবর মাঝের অংশে প্রজেকশান রয়েছে। দুটি স্তম্ভের উপর ভর করে। চারদিক মুক্ত ফলে আলো-বাতাসের স্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্য কোন বাঁধা নেই। দোতলায় একই রকমের ব্যবস্থা। ছাদের উপরে নটি পিরামিডের মতো বহুতলবিশিষ্ট শিখর। তার উপর খাঁজ-কাটা গোলাকার শীর্ষ। ঠিক মাঝের শিখরটি অন্যান্যদের থেকে সামান্য বেশি উঁচু। মহলের বাইরের খিলানে স্তম্ভে একদা অনেক কারুকৃতি ছিল। ফুল-লতাপাতা-পাখির ফ্রিজ ছিল। বর্তমানে সামান্য অবশেষ আছে তার।

চিত্র-৯৭। লোটাস মহলের অলঙ্করণ।

জাথায়া দেখাল — দেখুন স্যার, দেয়ালের মধ্যে মাটির পাইপ বসানো ছিল, তা দিয়ে দেয়ালের ভিতরে জল দেওয়া হত মহল ঠাণ্ডা রাখার জন্য। তখনকার দিনেও কেমন এয়ারকণ্ডিশন সিস্টেম ছিল, দেখেছেন?

জেনানা চত্বরের বাইরে ডানহাতে আরেকটি অঙ্গন রয়েছে। সবুজ ঘাস বিছোনো সুপ্রশস্ত অঙ্গনের একদিকে বিশাল হাতিশালা। দেখে মনে হল এবার যেন রীতিমতো রাজকীয় ব্যাপারে ঢুকে পড়েছি। হাতির জন্য হলেও এমন চোখ-ধাঁধানো ভবন না হলে চলে? পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে পরপর এগারোটি কক্ষ। মাঝেরটি বড়ো। তার দুপাশে পাঁচটি করে কামরা। নির্মাণ কৌশল নাকি বাহমনী স্টাইলে। সামনের দিকটা বিশাল উঁচু করে খিলান-করা। কামরার মাথার উপরে দুপাশে তিনটি করে গম্বুজ আর গম্বুজের মধ্যে দ্বাদশভুজের দুটি ভল্ট — খাঁজ-কাটা শীর্ষ নিয়ে। মাঝের বড়ো কামরার উপরে রয়েছে দুই তলে নির্মিত নহবতখানার

চিত্র-৯৮। হাতিশালা।

মতো কিছু একটা। এখন ভেঙেচুরে গিয়েছে। একেবারে নিচে দেবকোষ্ঠ দেখা গেল।

ভারতী বলল — হাতিশালা যদি হবে, তবে হাতি বাঁধার শিকল-টিকল কিছু নেই কেন?

— একদা ছিল নিশ্চয়ই।

— শিকল না থাকতে পারে তবে শিকল বাঁধার জন্য কোন ব্যবস্থা তো থাকবে। কই তাও তো নেই।

না, সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। হয়তো সময়ের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরে জেনেছি, আবদুর রাজ্জাক ভ্রমণকথায় লিখে গিয়েছেন, এখানকার হাতিশালায় হাতিদের উপর থেকে ঝোলানো শিকল দিয়ে বাঁধা হত।

একপাশে লম্বালম্বি আরেকটি ভবন দেখা যাচ্ছে। এটি রক্ষীভবন ছিল। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিছু নিদর্শন সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত নয়। বোধহয় প্রাপ্ত সামগ্রীর বিচার বিশ্লেষণ করার কাজ বাকি আছে।

কাছেই রঙ্গ মন্দির। চারদিকে ছড়ানো আরো নানা নির্মাণ-চিহ্ন।

জেনানা মহল থেকে উদ্ধার করে অটো. চলল খোদ রাজমহল এলাকায়। এখানে রাজার প্রাসাদ আছে। অদূরে রানির স্নানাগার। পরে দেখা হবে। প্রাসাদ এলাকায় দেখা হবে রাজভবন, দশেরা ডিব্বা, দরবার ইত্যাদি। মাটি থেকে বেশ খানিকটা উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে পাথুরে জল-নালা (অ্যাকুইডাক্ট)। ছোট ছোট পাথরের পিলারের উপর ভর করে। বোঝা গেল দুর্গের মধ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা কেমন ছিল।

পাশেই বাঁধানো কি একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জাথায়া বলল — এটা পুষ্করিনী। এমন সুন্দর বাঁধানো পুষ্করিনী সহসা দেখা যায় না। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে এটি। সিঁড়ি সোজাসুজি নিচে নামেনি। চারদিক থেকেই খনিকটা করে সিঁড়ি তারপর ল্যাণ্ডিং আবার কয়েকধাপ সিঁড়ি এবং ল্যাণ্ডিং - এমনি করে ধাপে ধাপে সিঁড়ি-ল্যাণ্ডিং নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। প্রত্যেক ল্যাণ্ডিং থেকে তিনদিকে সিঁড়ি নেমেছে পরবর্তী ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত। এমনি করে পাঁচটি ধাপে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি নেমেছে উপর থেকে নিচের দিকে। সবুজ সিস্ট পাথর দিয়ে তৈরী সিঁড়ি। এরকমভাবে ঘুরে ঘুরে নিচে নামার জন্য সুদৃশ্য সোপান আগে কখনো দেখিনি। অবশ্য রাজ-রাজড়াদের ব্যাপারই আলাদা।

চিত্র-৯৯। পুষ্করিনী, হাম্পি।

জাথায়াকে জিজ্ঞেস করলাম — খবরের কাগজে দেখলাম আরো একটি পুষ্করিনী আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। সে খবরটা জানো তো?

— না স্যর আমি দেখিনি, তবে শুনেছি। জাথায়া বলল।

পুষ্করিনীর উত্তর-পূর্বদিকে দশেরা ডিব্বা বা মহানবমী ডিব্বা। এটিকে সিংহাসন-বেদীও বলে।

চিত্র-১০০। দশেরাডিব্বা।

চিত্র-১০১। দশেরাডিব্বা।

পেজ অবশ্য বলেছেন একে বিজয়-ভবন। উড়িষ্যা জয়ের পরে কৃষ(দেবরায় এটি নির্মাণ করেছিলেন। একদা ভবনটি বহুতলবিশিষ্ট ছিল। বর্তমানে রয়েছে শুধু তার ভিতটুকু। উপরকার কোন নিদর্শনই আর নেই। ভিত তিন থাকে উঁচুতে উঠেছে, প্রায় বারো মিটার উচ্চতায়। একতলা চল্লিশ মিটার লম্বা বর্গাকার। উপরের তলও সমচতুষ্কোন, চব্বিশ মিটার লম্বা-চওড়া। ভিতের সামনের দিকটা গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক থাকের দেয়ালে হাতি অশ্ব সৈনিক নৃত্যাঙ্গনা বাদক ইত্যাদির চমৎকার বাস-রিলিফ। অল্প-উৎকীর্ণ ফ্রিজ। এক জায়গায় মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। অন্যত্র হাতি শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়েছে একজনের পা। হত্যায় উদ্যত ভঙ্গী। দুই নারী মানুষটিকে বাঁচাতে ছুটে আসছে। একটি শিকার-দৃশ্যে মেয়েরাও অংশগ্রহণ করছে দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় রানি সহচরী-পরিবৃতা হয়ে দেখছেন — মল্লযুদ্ধ না নাচ, ঠিক বোঝা গেল না। ভালো করে দেখার মতো সময় হাতে নেই। কোনরকমে চোখ বুলিয়ে ছুটছি। পশ্চিমদিকের খানিকটা ফ্রিজ সবুজ পাথরের। এদিকে সিঁড়ির ধাপ রয়েছে। রাজামশাই হয়তো সেই ধাপ ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে ডিব্বাটি

চিত্র-১০২,১০৩। দশেরা ডিব্বার অলঙ্করণ।

উত্তরমুখী। নয়দিন ব্যাপী নবরাত্রি উৎসবের সময় এই ডিব্বার বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। রাজা পূজার্চনা করতেন, অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হতেন, রাজন্যবর্গের ভেট গ্রহণ করতেন এবং উৎসবের শোভাযাত্রা দর্শন করতেন। এই ডিব্বার উপর বসে।

জাথায়া বলল — এখানে বিদেশীদের মূর্তি-খোদাই রয়েছে। দেখেননি?

— আগে বলোনি তো? কোন দেশের লোকজন?

— চিনাদের তো আছেই। তাছাড়া আরবী অশ্ব-বিত্রে(তাদেরও আছে।

জাথায়া আবার দেখাতে নিয়ে চলল। সত্যিই তাই। বিদেশীদের মূর্তি বলে ঠিক চেনা যায়। চিনাদের বিনুনি করা মাথায় কোনাওয়ালা টুপি এবং তরোয়াল।

মহানবমী ডিব্বার দ(ি ণ-পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ। বর্তমানে প্রাসাদ বলে আর কিছু নেই। আছে সামান্য ভগ্নাবশেষ — দৈর্ঘ্যে সাতাশ মিটার, প্রস্থে আঠারো মিটার আয়তন। মেঝের উচ্চতা দেড় মিটার। গ্রানাইট পাথরের ভিত। উত্তরের দিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ল(্য করা যাচ্ছে। আছে সবুজ ক্লোরাইট পাথর তৈরী হাতির

চিত্র-১০৪। রাজপ্রাসাদ।

রেলিংয়ের। তা থেকে অনুমান হয় যে প্রাসাদ ছিল উত্তরমুখী। এখনো ভিতের জায়গায় জায়গায় অশ্ব-হাতি-নৃত্যাঙ্গনার খোদাই আছে।

প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিমে সবুজ ক্লোরাইট পাথরের একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। মাটি থেকে অনেকটা নিচে। প্রকোষ্ঠের মধ্যে চারটি স্তম্ভের বেদীমাত্র অবশিষ্ট। চারদিকে পিলার-নির্ভর অলিন্দ। আগে এখানে বিগ্রহ ছিল মনে করা হয়।

চিত্র-১০৫। রাজদরবার।

ডিব্বার পশ্চিমে বিশাল এক সভাগৃহে রাজদরবার বসত। প্রায় চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থবিশিষ্ট এলাকা জুড়ে ছিল সেই হলঘর। একদিকে দশটি করে স্তম্ভ। মোট একশ' স্তম্ভের উপর গড়ে উঠেছিল ঐ সভাগৃহ। বর্তমানে স্তম্ভ নেই। রয়েছে তার খোদল এবং পীঠ। সভাগৃহ উত্তরমুখী। উত্তর দিকের দুই প্রান্তে দুটি সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। অভ্যাগতদের পৌঁছে দিচ্ছে দরবারের উঁচু চত্বরে। মাঝামাঝি

আরেকটি সিঁড়ি রয়েছে। তা দিয়ে যাওয়া যায় নিচু বারান্দা-চত্বরে। দরবারের তিনদিক ঘিরে রয়েছে নিচু বারান্দা-চত্বর। দ(িণে আরেকটি লম্বা সিঁড়ি রয়েছে। দীর্ঘ উত্থান তার — উপরতলে যাওয়ার ব্যবস্থা বলে মনে হয়। হলের পশ্চিমে উঁচু এক প-াটফর্ম ও সিঁড়িঘরের মতো কিছু নির্মাণ ছিল, এখন ভগ্নাবস্থায়। দেখেশুনে মনে হয়, হয়তো রাজাসন ছিল এখানেই। আবদুল রাজ্জাক যে শত-স্তম্ভের সভাঘরের কথা বলেছেন, সম্ভবত এই ধ্বংসাবশেষ সেই সভাঘর। দ(িণ-পূর্ব কোনায় বাধানো চত্বর দেখা যাচ্ছে। সেখানে হোমযজ্ঞাদি হত। পাশে মন্দির ছিল বলেও অনুমান হয়।

গোটা রাজপ্রাসাদ চত্বরে আস্ত একটি ইমারতও আর নেই। নির্মম হাতে যুদ্ধবিজয়ী মুসলিম লুণ্ঠনকারীর দল সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। এখান শুধু ইমারতের ভিতটুকু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তা দেখে পর্যটকদের মন ভরে না।

চিত্র-১০৬। হাজাররাম মন্দির।

পরবর্তী দ্রষ্টব্য স্থল হজার-রাম মন্দির। অবস্থান প্রাসাদ এলাকার উত্তর-পশ্চিমে। রামচন্দ্ররূপে বিষু(পূজ্যদেবতা ছিলেন। বর্তমানে কোন বিগ্রহ নেই। হজার-রাম কথাটা শুনে আগে মনে হয়েছিল এটা এক হাজার রামের মন্দির। স্থানীয় লোকেরাও তেমন বি(াস করে। কেননা এখানে সত্যিই অনেক রামের মূর্তি আছে। জানা গেল, কথাটা হাজার রাম নয়, 'হজরামু'। তেলেগু ভাষায় তার অর্থ হল প্রাসাদ-সংলগ্ন দরবার হল বা প্রবেশ ক(।

— তাহলে কি এই মন্দিরটি রাজপরিবারের নিজস্ব মন্দির হিসেবে গণ্য হত?

— হ্যাঁ, ঠিক তাই। জাথায়ার জবাব।

প্রাকার-বেষ্টিত মন্দিরচত্বর। প্রাকারের তিনদিকের দেয়ালে পাঁচ লাইনে অজস্র মূর্তির ফ্রিজখোদিত রয়েছে। অল্প-উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে। সারি দিয়ে চলেছে হাতি আর ঘোড়ার দল, বিজয়নগরের সেনাদল এবং নৃত্যরতা সুন্দরীরা। আর আছে কৃষ(লীলার কাহিনী।

চিত্র-১০৭, ১০৮। উপরে হাজাররাম মন্দির, নিচে প্রাচীর চিত্র।

চিত্র-১০৯। ভাস্কর্য, হাজাররাম মন্দির।

উত্তরদ্বার থেকে পূর্বদ্বারের মধ্যে রামায়ণের কাহিনী খোদিত। শ্রবণকুমারের কথা দিয়ে শু(। অশোক বনে বন্দিনী সীতা। তাঁকে ঘিরে অনুচরীবৃন্দ। হনুমানকে দেখা যাচ্ছে একবার গাছপালার আড়ালে, একবার সীতার কাছ থেকে রত্নালঙ্কার গ্রহণ করছে, আরেকবার রা(স হত্যা করতে। চারদিকে এত সুন্দর মূর্তি যে কোন ছবিটা ছেড়ে কোনটার ছবি তুলব ঠিক করা কঠিন। জাথায়া বলল — ছবি পরে তুলবেন, আগে মন্দির দেখে নিন। ভিতরে চলে আসুন।

চিত্র-১১০। ভাস্কর্য, হাজাররাম মন্দির।

মন্দিরের দুটি প্রবেশদ্বার — পূর্ব ও উত্তর। মূলমন্দির ছাড়া উত্তরদিকে আম্মান-মন্দির রয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণায় একটি হলঘর। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে বাইরের পাঁচিল ঘেসে থামওয়ালা লম্বা অলিন্দ দেখা যাচ্ছে। দ(িণ-পশ্চিমে আরেকটি হলঘর রয়েছে।

ত্রিতল মন্দিরবিমান । গর্ভগৃহে মূলদেবতা শ্রীরামচন্দ্র। তারপর যথরীতি অন্তরাল-অর্ধমণ্ডপ এবং পূর্বদিকে বড়ো আকারের মণ্ডপ। তিনদিকে থামওয়ালা বারান্দা ও সিঁড়ি। গর্ভগৃহের বাইরের দেয়াল তিন খণ্ডে (বে) এবং দুটি খাঁজে (রিসেস) বিভক্ত(। তার মধ্যে দেবকোষ্ঠ আছে। দুপাশে বৈষ(ব দ্বারপাল। মণ্ডপের বাইরের দেয়ালও একই রকমভাবে খাঁজে খাঁজে বিভক্ত(। চূড়োয় চৌকো গ্রীবার উপর গম্বুজের মতো শিখর। অন্তরালের উপর সামনের দিকে শিখরদেশ প্রসারিত। এই শৈলীকে শাল-শিখর বলে।

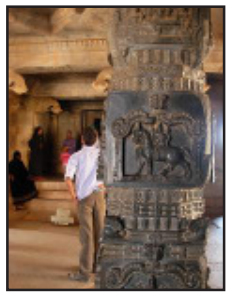

চিত্র-১১১। কলকি।

মণ্ডপের ঠিক মাঝখানে কালোপাথরের চারটি সুদৃশ্য স্তম্ভ রয়েছে। চারকোনা পীঠের উপর স্তম্ভ দণ্ডায়মান। বর্গাকার তিন থাকে উৎকীর্ণ রয়েছে গণেশ, মহিষাসুরমর্দিনী, হনুমান এবং বিষু(র নানা অবতার। তার মধ্যে একজন হলেন কলিযুগের কলকি। তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে অ(াসনে উপবিষ্ট বিষু(রূপে। ইনি ব্রাহ্মণ হলেও ম্লেচ্ছগণের উৎসাদক। শঙ্খ-চক্র(-অসি এবং ঢাল ধারণ করে

রয়েছেন। য়তদূর জানি বিষ(ুর এই অবতার কলকি এখনো অবতীর্ণ হননি ধরাধামে। তিন থাকের বর্গাকার স্তম্ভের মাঝখানে রয়েছে অষ্টভুজ গঠন।

হজাররাম মন্দির নির্মিত হয়েছে বহু প্রাচীনকালে — এরকমটাই দাবী করা হচ্ছে। প্রথম কারণ, মন্দিরের প্রাচীনতম শিলালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। শিলালিপিতে এক দেবরায়ের উল্লেখ আছে, তবে তা পূর্ববর্তী কোন দেবরায়েরও হতে পারে। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত এক লিপিতে বলা হয়েছে রানি অম্নোলাদেবী মন্দিরের কার্যনির্বাহের জন্য এক অনুদান মঞ্জুর করেছেন। এর অর্থ মন্দিরটি তার আগে থেকেই ছিল। রাজা দেবরায়-২ (১৪২২-৪৬) এর পুন্নালাদেবী বা হোন্নালাদেবী নামের এক রানি ছিলেন। অম্নোলাদেবী হয়তো তিনিই।

মূল মন্দিরের উত্তরদিকে যে দেবীমন্দির রয়েছে সেটি দ্বিতল মন্দির। পরবর্তীকালে রাজা কৃষ(দেব রায়ের আমলে নির্মিত হয়েছে। চত্বরের উত্তর কোণায় নির্মিত হয়েছে কল্যাণ-মণ্ডপ। নির্মাণ-কাল ১৫২১ সাল।

চিত্র-১১২। হাজাররাম মন্দির।

হজাররাম মন্দিরটি আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। এখানে আরেকটু থাকতে পারলে ভালো হত। উপায় নেই, অটো ড্রাইভার হনুমান তাড়া লাগাচ্ছে। মন্দিরের চারদিকে ছড়ানো রয়েছে অজস্র মূর্তি আর কা(কার্য। রামায়ণের নানা কাহিনী খোদিত রয়েছে বাস রিলিফে। জাথায়া বলল — তিন ধাপে মোট ১০৮টি চিত্র আছে। ঋষ্যশৃঙ্গমুনির পুত্র-কামেষ্ঠি যজ্ঞ, সীতার স্বয়ম্বর সভায় হরধনুভঙ্গ, বিবাহের পরে হস্তিপৃষ্ঠে রাম, স্বর্ণমৃগ ল(্য করে শর-সন্ধান, সীতার কুটিরে ভি(বেশী রাবণ, রামের এক শরে সাত সাতটি বৃ(-ছেদন, রামের নিকট হনুমান কর্তৃক সীতার মুকুট অর্পণ, রথে বসে রাম-বাবণের যুদ্ধ।

চিত্র-১১৩। ভাস্কর্য, হাজাররাম মন্দির।

ঝটিতি চোখ বুলিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম। তারপর নিজের উপরই বিরক্তি(এসে গেল। বললাম — দূর ছাই, এত কম সময় হাতে করে এখানে আসার তো দেখছি কোন মানেই হয় না। হয় বলো?

— একেই বলে, লোকে খেতে পেলে শুতে চায়। মোটেই দেখা হচ্ছিল না। এখন যাও বা হচ্ছে, তাতে মন উঠছে না। ভারতী জবাব দেয়।

— আচ্ছা সত্যি করে বলো, এটুকু দেখে মন ভরে?

— ভরে না। যতটুকু ভরে তাই নিয়ে খুশি থাকো। না হলে তো উপোস।

অটো ছুটল কুইনস-বাথের দিকে। সামান্য দূরে। যেতে যেতে ভারতীর কাছে জানতে চাই — রানিদের স্নানাগারে উঁকিঝুকি দেওয়া কি ঠিক হবে? রাজামশাই জানতে পারলে নিশ্চয়ই গর্দান নেবেন।

— তাতো দেবেনই।

চিত্র-১১৪। রানির স্নানাগার।

রানি-স্নানাগারে দেখা যাচ্ছে খিলান করা অলিন্দ, ঝোলা বারান্দা, আর কমলাকৃতি ফোয়ারা। ষষ্ঠদশ শতকে ইন্দো-সারসৈনিক শৈলীতে তৈরী। পনেরো মিটার বর্গাকার বাথটবের গভীরতা প্রায় পৌনে দু'মিটার। একবার উঁকি দিয়ে দেখেই ফিরে এলুম।

হাবেভাবে অটোচালক গজগজ করছে। জাথায়াকে জিজ্ঞেস করলাম — কী হয়েছে ওর?

জাথায়া বলল — মনে হচ্ছে, ওর দেরী হয়ে যাচ্ছে।

— কেন কথা ছিল সবকিছু ঘুরে ভালো করে দেখাবে। ছিল না সেরকম কথা?

— হ্যাঁ তা তো ছিল। ও বলছে যে ওর খিদে পেয়েছে।

— তাহলে খেয়ে নিক। আমরাও খেয়ে নিতে পারি। পরে বাকি যা আছে তা দেখা যাবে।

জাথায়া হনুমানের সঙ্গে অনেক(ণ ধরে ওদের দেশীয় ভাষায় কথা বলল। এক বর্ণও বুঝলুম না। তবে এটা বোঝা গেল, হনুমান এমন সরল সমাধানেও খুশি নয়। একটু পরে জাথায়া জানাল — হনুমান বলছে ও আগে খাবে না, আর একটা জায়গা বাকি আছে সেটা দেখিয়ে ও চলে যাবে।

— আর একটা জায়গা বলতে?

— বিঠালা মন্দির।

— কিন্তু যতদূর জানি আরো বেশ কিছু দেখবার মতো জিনিস আছে। সেসব কি হবে!

জাথায়া উত্তর দিল না। ভারতী চুপিচুপি বলল — ঝগড়াবিবাদ করে দরকার নেই। চারদিকটা যা ফাঁকা নির্জন, তারপর কোথায় কোন পাঁদাড়ে ফেলে পালাবে কে জানে! ও একটা জায়গা দেখাতে চায় সেটাই দেখা যাক। তারপর বাসস্ট্যাণ্ডে ছেড়ে দেয় যেন।

বললাম — দেখাতে না চাইলে কি আর করা যাবে। বিঠালা মন্দিরই দেখাক।

অটোয় চড়ে বসতেই হা হা করে গাড়ি নিয়ে ছুটল। সোজা বিঠালা মন্দিরের দিকে। পথে চন্দ্রশেখর মন্দির ছিল। দূরে অষ্টভুজ স্নানাগার। সরস্বতী মন্দির ছিল। অটো আর্কিওলজিকাল অফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। পথে পড়ল গাণিগিত্তি জৈন মন্দির। এগিয়ে ডানহাতে মাল্যবন্ত পর্বতের চূড়োয় রঘুনাথ মন্দির। তারপর হনুমান মন্দির, শিব মন্দির ও তালারিগাত্তু দরজা। এবার বাঁদিকে ঘুরে অটো ঢুকল বিঠালা মন্দিরের পথে। এখানেও রয়েছে ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন। ভিতের পাথর সাজানো রয়েছে সারি সারি।

জাথায়া বলল — এদিকটা ছিল রত্ন-বাজার এলাকা। সমৃদ্ধ বিজয়নগরে তখন সোনাদানা হিরে-জহরত মুঠো মুঠো করে ক্র(য়-বিক্র(য়ে হত এই বাজারে। পথের দুপাশে।

হাম্পিবাজার থেকে পূর্বদিকে তুঙ্গভদ্রার তীরে অবস্থিত হাম্পির শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বিঠালা মন্দির। তালারিগাট্টু তোরণের পশ্চিমে। মন্দিরের অস্তিত্ব কমপ(ে দ্বিতীয় দেবরায় আমল থেকে। কেননা দ্বিতীয় দেবরায়ের সেনাপতি প্রলুগাস্তি টিপ্পা এখানে এক ভোগমণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন। যতদিন রাজা ছিল, রাজধানী ছিল, ততদিন এখানে পূজাপার্বন হত। তারপর সবই ভগ্নস্তূপ। ঐতিহাসিক নিদর্শন মাত্র।

১৬৪ মিটার দীর্ঘ এবং ৯৪.৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট আয়ত(ে ত্রে বিন্যস্ত বিঠালা মন্দির কমপে-ক্স হাম্পির মধ্যে সবথেকে বেশি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ইমারত। বিজয়নগরের সর্বোৎকৃষ্ট শৈল্পিক প্রকাশ। জাথায়া ঠিকই বলেছিল — আমরা সবশেষে বিঠালা দেখাই কেন বুঝলেন তো এবার। নিন, ছবি তুলুন যত পারেন। রিল শেষ হয়ে যাবে, ছবি-তোলা শেষ হবে না।

সত্যিই তাই। গোটাকয়েক গাড়ি অপে(া করছে মন্দিরের বাইরে। বেশ কিছু দর্শনার্থী এসেছে। পুলিশের খানকয়েক গাড়িও রয়েছে মনে হল। কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এসেছেন হয়তো। তাদের সিক্যুরিটির জন্য অনেক পুলিশ।

বিঠালা মন্দিরে তিনটি বিশাল গোপুরম আছে পূর্বে এবং উত্তর-দ(ি ণে। বর্তমানে সবই জরাজীর্ণ অবস্থায়। দ(ি ণের গোপুরটি সবথেকে বেশি অলঙ্কৃত ছিল। মূলমন্দির নির্মিত হয়েছে গর্ভগৃহ-অন্তরাল-অর্ধমণ্ডপ ও মহামণ্ডপ নিয়ে। দৈর্ঘ্যে সত্তর মিটার হলেও উচ্চতায় কেবল সাড়ে সাত মিটার। ফলে মন্দিরের বিস্তৃতি যত, উচ্চতা সে

চিত্র-১১৫। গোপুরম, বিঠালা মন্দির।

তুলনায় কম। সুবিশাল মন্দির চত্বরে মূলমন্দিরের সঙ্গে রয়েছে এদিককার রীতি অনুযায়ী আম্মান (দেবী) মন্দির। তাছাড়া রয়েছে কল্যাণ মণ্ডপ, উৎসব মণ্ডপ, একশত-স্তম্ভবিশিষ্ট আরেকটি মণ্ডপ এবং একটি রথ। মন্দির-প্রাকার ঘেঁষে অনেকটা দৈর্ঘ্য জুড়ে টানা বারান্দা। ইট এবং পাথরের নির্মাণ সবই।

চত্বরের ভিতরে পা রাখতে প্রথমেই নজর কাড়বে সুন্দর প্রস্তর-রথখানি। পত্রপত্রিকায় হাম্পির ছবি মানেই এই রথের ছবি দেখা যায়। হাতি রথ টানছে। আমরা বৈষ(ব মন্দিরের প্রবেশপথে সাধারণত গ(ড় মূর্তি দেখতে পাই। এখানেও রয়েছে গ(ড় মূর্তি তবে তা রথে-চড়ে। কাঠের রথের মত করেই

চিত্র-১১৬। বিঠালা মন্দির।

চিত্র-১১৭। প্রস্তর-রথ।

নির্মাণশৈলী। স(ছোট ছোট পিলার দিয়ে সাজানো কুলুঙ্গি। নিচে খুদে খুদে ফ্রিজ চিত্রে ভরাট উপান পীঠ। অ(দণ্ডের উপর চারটি পাথরের চাকা আছে। তবে কোণার্কের চাকার মতো অর-বিশিষ্ট চাকা নয়। এগুলো ভরাট চাকা। তার উপর গোল করে খোদিত নানা চিত্র। অতীতে চাকাগুলো নাকি ঘুরত। রথ বসে গিয়েছে বলে এখন আর ঘোরে না।

ভারতী শুনে বলল — তা আর বসবে না? যা অনাচার চারদিকে!

হাসতে হাসতে জাথায়া বলল — ঠিক বলেছেন দিদিভাই, এই রথের উপরে ইঁটের তৈরী শিখর ছিল। এখন আর নেই।

মূলমন্দিরের পূজ্য দেবতা বিষু(। তিনি এখানে বিট্টালা বা বিঠালা নামে পূজিত হচ্ছেন। পূর্বমুখী মন্দিরের গর্ভগৃহ ও অন্তরাল বেষ্টন করে আছে প্রদ(ি ণপথ। যেমন থাকে আর কী। দু'পাশে দুটি বারান্দা (সাইড-পোর্চ) নিয়ে তার সামনে রয়েছে অর্ধমণ্ডপ। একেবারে সামনের দিকে রয়েছে চারদিক-খোলা মহামণ্ডপ। এটি ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

গ(ড়-রথ দেখে আমরা মহামণ্ডপে পা রাখলুম। মহামণ্ডপের তিনদিকে রয়েছে উপরে ওঠার ধাপ। পূর্বদিকের সিঁড়ির দুপাশে রয়েছে হাতির রেলিং আর উত্তর-দ(ি ণ

দিকে সিঁড়ির দুপাশে 'শু(ল-বলি' রেলিং। মণ্ডপের সামনে নোটিশ ঝোলানো — দর্শকেরা কোনকিছুই স্পর্শ করবেন না। কারণ মন্দিরের ক(ণ ভগ্নদশা। সামনের খানিকটা ছাদ ভেঙে গিয়েছে। কিছু পিলার-বিমও বিপজ্জনক অবস্থায়। এর মধ্যে কোনো পিলারে ধাক্কা লাগলে বা ঠেলাঠেলি করলে উপরের ছাদ নিয়ে তা ভেঙে পড়তে পারে।

পুলিশের বড়োকর্তা বিঠালা-দর্শনে এসেছেন বিশাল দলবল নিয়ে। জাথায়া প্রতাপশালী দলটি এড়িয়ে আমাদের মহামণ্ডপের একপাশে সরিয়ে আনল। তারপর বলতে লাগল — মহামণ্ডপের আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাড়ে তিরিশ মিটার করে। দেড় মিটার উঁচু মোল্ডিং করা অধিষ্ঠান। অ(, সৈনিক এবং হংসশ্রেনীর ফ্রিজ দ্বারা সুসজ্জিত। সারির মাঝেমাঝে ছোট ছোট দেবকোষ্ঠ।

মহামণ্ডপটি চতুষ্কোন নয়। তিনদিকে অনেকটা তারার মতো খাঁজ-কাটা। ক(ছাপ্পান্নটি অতীব সুদৃশ্য পিলার আছে। বারো ফুট উঁচু। নক্সাটা এরকম। যে কোন দিকের সিঁড়ি দিয়ে মণ্ডপে উঠলে সামনে পড়ছে বারোটি স্তম্ভে সাজানো খানিকটা জায়গা। কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ষোলোটি স্তম্ভ দিয়ে

চিত্র-১১৮। বিঠালা মন্দির।

চিত্র-১১৯। বিঠালা মন্দির।

সাজানো চৌকো আকারের জায়গা। কোনো স্তম্ভই সরল সাদাসিধে নয়। মানে স্রেফ চৌকো বা গোল আকারের নয়। বরঞ্চ অত্যন্ত জটিল নক্সায় ভরাট। মনে হয় মূল স্তম্ভের সঙ্গে সংযুক্ত(রয়েছে প্রভূত অলঙ্করণে সমৃদ্ধ বাড়তি স্তম্ভভাগ। সবটাই একশিলায় নির্মিত। এজাতীয় কম্পোজিট পিলার আমরা বিরূপা(মন্দিরে দেখেছি। স্তম্ভের নিচের দিকে মূর্তি। মধ্যভাগে স্তম্ভের সংলগ্ন অংশে কোথাও মূর্তি, কোথাও বা পিলপার সারি। উপরের দিকে আবার মূর্তি এবং অলঙ্করণ। স্তম্ভের উপরে ভারী পুষ্পপোদিগাই কর্বেল রয়েছে।

চিত্র-১২০। বিঠালা মন্দির।

মণ্ডপের মাঝের দিকের স্তম্ভে কোন পিলপা নেই। তার বদলে রয়েছে বলি-মূর্তি, নরসিংহ, সুন্দরী-নর্তকী ও বাদিকার মূর্তি। কোণার দিকের স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত(রয়েছে কাঠির মতো স(এবং খাটো একগুচ্ছ করে পিলপা। সংখ্যায় কোথাও চার, কোথাও বা আট, কোথাও ষোলো। গাইড স্তম্ভের গায়ে কান পাততে বলল। তারপর পিলপায় টোকা দিয়ে বলল — কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

বললাম — হ্যাঁ পাচ্ছি। সারেগামার সাতটা সুর।

— এবার আসুন এখানে। আরেকটা স্তম্ভের কাছে নিয়ে এসে বলল — দিদি শুনুন, কি শুনছেন?

— এবার জলতরঙ্গ বাজছে বলে মনে হচ্ছে।

এমনি করে জাথায়া এক একটা স্তম্ভের কাছে নিয়ে গিয়ে পিলপায় টোকা দিচ্ছে আর আমাদের শোনাচ্ছে নানা সুর। শুনতে পেলাম সেতারের টুংটাং শব্দ, মৃদঙ্গের বোল। এমন কী কলিংবেল বা স্কুলের ঘন্টার বেল পর্যন্ত। ঘুরেফিরে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই সব নানা ছন্দের স্তম্ভ দেখে যেতে লাগলুম। স্তম্ভের বৈচিত্র্য নির্বাক করে রাখল।

একতলা মহামণ্ডপের বেশ খানিকটা অংশে ছাদ নেই, সেখান থেকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাকি অংশের সিলিংয়ে বহুদল পদ্মফুল খোদিত। বেশ গভীর করে। কোথাও কোথাও রয়েছে রঙিন চিত্রাঙ্কণ। সামান্য অবশেষ এখনো কালচক্রে(টিকে আছে।

চিত্র-১২১। ভগ্নদশা, বিঠালা মন্দির।

মহামণ্ডপের পরে দেয়াল-ঘেরা বর্গাকার অর্ধমণ্ডপ। মধ্যে ষোলোটি স্তম্ভ। অতীব জীর্ণ অবস্থায়। সমস্তটাই ছাদবিহীন প্রায়। এক কোণায় বিশাল গ্রানাইট পাথরের দ্বারপাল মূর্তি রয়েছে। বিশাল মানে বিশালই, প্রায় দুমানুষ উঁচু মূর্তি। অর্ধমণ্ডপ থেকে অন্তরাল-গর্ভগৃহ বেষ্টন করা প্রদ(ণপথে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহে শূন্য দেবপীঠ। দেবতা নেই। বিজয়নগরের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্তর্ধান করেছেন। বিজয়নগরবাসীরা তাঁকে র(া করতে পারেনি। গর্ভগৃহের উপরে ত্রিতল বিমান। মোটামুটি অ(ত চেহারা নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে অলঙ্কৃত দেবকোষ্ঠ বর্তমান। বিমান ইষ্টক নির্মিত। শিখর গম্বুজাকার।

এমন কা(কার্যময় মন্দিরের হতশ্রী জরাজীর্ণ দশা দেখে কষ্ট হয়। রোষভরে বললাম — দেখেছ, দেবতারা এত কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, র(া করতে পারেন, আর নিজের মন্দিরখানা নিজে র(া করতে পারেন না। এ কেমন (মতা দেবতার!

পাশের আম্মান মন্দিরে বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু নেই। গর্ভগৃহের উপরের অংশও লুপ্ত হয়েছে। মন্দিরের বাইরের দেয়াল সাদামাটা। ওদিকে পা বাড়াই নি আর।

দ(িণ-পূর্ব কোণায় অবস্থিত কল্যাণ-মণ্ডপটি বরঞ্চ সুন্দর লাগল। এটিও চারদিক খোলা মণ্ডপ। অনেকটা মহামণ্ডপের মতো। প্রভূত অলঙ্করণে সমৃদ্ধ এর স্তম্ভ, রেলিং ও সিলিং। চত্বরের উত্তর-পূর্ব কোণায় রয়েছে উৎসব-মণ্ডপ। গঠন ও অলঙ্করণ কল্যাণ মণ্ডপের মতোই। দ(িণ দিকের প্রাকার ঘেষে একশ' স্তম্ভের দীর্ঘ মণ্ডপ রয়েছে। সাদামাটা মণ্ডপ, কিছু দর্শনীয় নেই। এখানে তিনটি

চিত্র-১২২। কল্যাণমণ্ডপ, বিঠালা মন্দির।

চিত্র-১২৩। ভাস্কর্য।

ভাষায় লিখিত তিনটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ(দেব রায় এই মণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন। সেকথা তিনটি লিপিতেই ঘোষিত হয়েছে।

বুঝতে পারলাম, শুধু এই বিঠালা মন্দির জমিয়ে দেখতে হলে একটা গোটা দিন খরচ হয়ে যাবে। যদি সত্যি ভালো করে দেখতে হয়। আমরা 'ওঠ-ছুঁড়ি-তোর-বিয়ে' কায়দায় সবকিছু দেখতে এসেছি। মাত্র একদিন সময় হাতে নিয়ে। নিদা(ণ নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছি। কিন্তু উপায়ও তো কিছু নেই।

বিঠালা মন্দিরের দ(িণ-পশ্চিমে কিংস-ব্যালান্স, রাজ-তুলাদণ্ড। এই দাড়িপাল্লায় নাকি রাজাকে ওজন করা হত। আসলে রাজার অভিষেকের সময় তুলাপু(ষ-দানের প্রথা ছিল। তখন তুলাদণ্ডের একদিকের পাল্লায় রাজা বসতেন, অন্য পাল্লায় থাকত শস্য, মুদ্রা বা স্বর্ণ। সেই পরিমাণ শস্য বা মুদ্রা বা স্বর্ণ বিতরণ করতে হত। দুটি বিশাল গ্রানাইট পিলার আর এক প্রস্তর-কড়ি দিয়ে তুলাদণ্ডটি নির্মিত হয়েছে। একটি পিলারে রাজা ও দুই রানির মূর্তি খোদিত রয়েছে।

চিত্র-১২৪। কিংস ব্যালান্স।

হাম্পি-দর্শন সাঙ্গ হল। বিঠালা মন্দির দেখিয়ে অটো আমাদের নামিয়ে দিল কমলপুর। ফেরার বাস এখান

থেকে পাওয়া যাবে। হাম্পি অবধি যেতে হবে না। চালক হনুমান ওর প্রাপ্য ভাড়া বাবদ দেড়শ' টাকা বুঝে নিয়ে হাওয়া। সাড়ে চার ঘন্টায় দেড়শ' টাকা। আয় তো কম হল না। নিশ্চয়ই ও আরেক খদ্দের ধরতে ছুটেছে।

বেলা তিনটে বাজে। এত(ণে খেয়াল হল, খিদে পেয়েছে। কোন সকালে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়েছি। খিদের আর দোষ কী! বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই হোটেল আছে। গাইডের পরামর্শ মতো সেখানেই তিনজনের দুপুরের লাঞ্চ সারা হল। দ(িণ ভারতীয় খানা।

তারপর গাইড-চার্জ হিসেবে জাথায়ার প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিলাম। সঙ্গে কিছু বকশিশ। খুশি মনে বিদায় নিল। আবার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল। সেই সঙ্গে ওর হসপেটের ঠিকানা।

আমাদের হাতে সময় আছে। ভারতীর হায়দ্রাবাদী দাদা তো এলেন না হাম্পি দেখতে। অথবা হয়তো এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। বাড়ি ফিরে এ(নি কী লাভ! তার থেকে হাম্পির মিউজিয়াম দেখা ভাল।

ডানদিকে ঘুরে সামান্য এগিয়ে বাঁ হাতে পড়ল মিউজিয়াম। প্রবেশমূল্য পাঁচ টাকা। আর্কিওলজি বিভাগ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকার খোঁজ করতে ওরা একগুচ্ছ কাগজপত্র হাতে গুঁজে দিল। আসলে আমি বাদামী-আইহোলের এবং সম্ভব হলে বেলুড়-হলেবিদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রকাশিত বইপত্র চাইছি। পাচ্ছি না।

মিউজিয়ামের চারধারে মুক্ত(চত্বরে সাজানো রয়েছে অনেক সম্পদ। হাতে ব্যাগ-বোঝকা-ক্যামেরা ছিল। কাউন্টারে জমা করিনি। এসব নিয়ে মিউজিয়াম ক(প্রবেশ নিষেধ। সেজন্যে দুজনে একসঙ্গে মিউজিয়ামের ভিতরে না গিয়ে এক একজন করে যাচ্ছি। তিন কামরায় বিভক্ত(প্রত্নতাত্ত্বিক নানা নিদর্শন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রীও। ভালো লাগল হাম্পিতে খননকার্যের আগের ছবি এবং খননের ফলে প্রাপ্ত সামগ্রীর ছবি দেখতে।

চিত্র-১২৫,১২৬। মিউজিয়াম প্রাঙ্গনে।

মিউজিয়ামের কিছুটা পূর্বদিকে রয়েছে পট্টভিরামা মন্দির। ১৫৩০-৪২ সালের মধ্যে এই মন্দির নির্মিত, কারণ এর নির্মাতা রাজা অচ্যুত রায় (১৫৩০-১৫৪২খৃঃ)। দুটি শিলালিপি রয়েছে। আয়তনের দিক থেকে এটি সর্ববৃহৎ না হলেও অনেকটা বিঠালা মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। তবে ওরকম কারকার্যমণ্ডিত নয়।

তুঙ্গভদ্রার দ(িণ পাড়ে হাম্পি বাজারের পূর্বদিকে খাড়াই পর্বতটির নাম মাতঙ্গ পর্বত। এই সেই রামায়ণ-খ্যাত মাতঙ্গ। সুগ্রীব রাজ্যচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। কাম্পিলি যাত্রাপথে রামের আবাস হয়েছিল মাল্যবন্ত পর্বত। সেখানে মাল্যবন্ত রঘুনাথ মন্দির আছে। নিকটস্থ নিম্বপুরম গ্রামে স্কোরিয়াস ছাইয়ের যে ঢিবি রয়েছে তা বানর রাজ বালির সমাধি(ে ত্র নামে পরিচিত। বালিবধের স্থানেও একটি স্তূপ আছে নাকি। জাথায়ার কাছ থেকে পরিষ্কার হল না, ঐ দুটি স্তূপ একই না ভিন্ন ভিন্ন।

বালি বধের পরে শ্রীরামের হাতে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক হয়। তার স্মারক রূপে নির্মিত কোদণ্ডরামা মন্দির। হাম্পি বাজারের পূর্বদিকে এবং পবিত্র চত্র(তীর্থ নামের নদীঘাটের বিপরীতে। সাড়ে চার মিটার উঁচু রাম-সীতা-ল(্মণের বিগ্রহ আছে। গর্ভগৃহের সামনে কল্যাণমণ্ডপ। পাশে সূর্যনারায়ণ নামের মন্দির যেখানে ষোলো হাতের সুদর্শন মূর্তি রয়েছে। কাছেই 'যন্ত্রধারক অঞ্জনেয়' নামক গোলাকার যন্ত্রের উপর অধিষ্ঠিত হনুমানের মন্দির।

কোদণ্ডরামা মন্দির থেকে অল্প দূরত্বে রয়েছে সুলাই বাজারের ধ্বংসাবশেষ। তার দ(িণতম প্রান্তে প্রাকার-বেষ্টিত অচ্যুত রায় মন্দির। নির্মাণ করেছেন অচ্যুত রায়। শিলালিপি অনুসারে দেবতাকে বলা হত তি(ভেঙ্গলনাথ। এই মন্দিরের দুটি প্রাকার। গোপুরম আছে। মহামণ্ডপ-অর্ধমণ্ডপ-প্রদ(িণপথ-গর্ভগৃহ-অন্তরাল ইত্যাদি সহকারে নির্মিত উত্তরমুখী মন্দির। আম্মান মন্দিরও আছে। অচ্যুত রায় মন্দিরের কাছেই রয়েছে রাম মন্দির। আগে একে জৈনমন্দির মনে করা হয়েছিল। পূর্বমুখী মন্দির। হাম্পিতে একমাত্র এই বৈষ(ব মন্দিরটিই কদম্ব রীতি অনুসারে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট। হাতি, গ(ড়, গজলক্ষ্মী, হনুমান এবং বৈষ(ব-দ্বারপালের মূর্তি রয়েছে।

রাম মন্দিরের বিপরীতে রয়েছে সুগ্রীব-গুহা, যেখানে সীতার উত্তরীয়-অলঙ্কারাদি সযত্নে রাখা হয়েছিল। বাঁদিকে সীতা-সরোবর। কাছেই ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত সেতুর ধ্বংসাবশেষ। নির্মাতা যে কম্পভূপ, তিনি দ্বিতীয় হরিহরের ভাই না পুত্র তা নিয়ে মতভেদ আছে পুরাতত্ত্ব বিভাগে।

অঞ্জনগিরি, ঋষ্যমূক পাহাড় এবং পবিত্র পম্পাসর পুষ্করিনী — এসব রয়েছে তুঙ্গ ভদ্রার উত্তর তটে। অ্যানেগোণ্ডি নামে পরিচিত এই এলাকায় আরো অনেক ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ আছে। চালুক্য এবং বিজয়নগর সময়কালের দুর্গ, মন্দির ও প্রাসাদের

ধ্বংসাবশেষ। এদিকটাতেই কৃষ(দেব রায়ের গ্রীষ্মকালীন রাজপ্রাসাদ ছিল। ছিল তালিকোটার যুদ্ধের পর অ্যানেগোণ্ডি রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। ছিল হুচ্চাপ্পা-মঠ এবং গণেশ মন্দির। অঞ্জুনহাল্লিতে রয়েছে পম্পা সরোবর মন্দির এবং অনেক ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের নিদর্শনাদি নিয়ে একটি গুহা। জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিও আছে। সেসব আমাদের দেখা হল না।

এই কয়েক ঘন্টায় সত্যি কতটা দেখতে পেলাম? সামান্য, অতি সামান্য। এমন করে দৌড়লে কি কিছু ভালো করে দেখা যায়? চোখের দেখাটা পর্যন্ত নয়। সত্যি কথা বলতে কী, একটা দিনের মধ্যে অনেক কিছু একসঙ্গে দেখাও যায় না। কারণ তা মগজের বশে থাকে না। বারবার মনে পড়ছিল দেবদ্যুতি থাকলে বেশ হত। সকলে তো এসবের রস আস্বাদন করতে পারবে না। আকর্ষণ করবে না তাদের। ভারতীও একমত — একবার দেবদ্যুতিকে নিয়ে আসতে হবে। ধার করে আনা মোবাইলটা ঠিক কাজ করছিল না। নয়তো হাম্পি থেকেই ওকে ফোন করে বলতাম — কবে হাম্পি আসবে বল?

এমন সময় বাস এসে গেল।

কমলপুর থেকে হসপেটের ভাড়া ছ' টাকা। পথে অনন্তশয়নগুডি নামে একটি গ্রাম পড়ে। সেখানে রাজা কৃষ(দেব রায় কর্তৃক নির্মিত বিষু(মন্দির আছে। ১৫২৪ সালের এক শিলালিপি থেকে জানা যায় রাজা এখানে পুত্রের সম্মানে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে এক মন্দির।

ফিরে আসতেই হোটেলের ম্যানেজার বলল — বিকেল বেলায় আপনারা তুঙ্গভদ্রা ড্যাম ঘুরে আসুন। ভালো লাগবে।

ইচ্ছে হল না। হসপেট আসার পথে বাঁধের পাশ দিয়েই তো এসেছি। বিশাল জলাধার। সবুজ দিয়ে সাজানো উদ্যান। আলো ঝলমল চেহারা। এক ঝলক তখন দেখেছি। এখন হাম্পির স্নিগ্ধ আবেশ থেকে মন অন্যত্র সরতে চাইছে না। একটা বড়োসরো পাহাড়ী এলাকা জুড়ে কত মন্দির-প্রাসাদ, রাজারানি, যুদ্ধ ও ধ্বংসাবশেষ, পুরাণকথার গন্ধ, ইতিহাসের এই সব স্মৃতি-মেদুরতায় অবসন্ন হয়ে রয়েছি। মনে আছে, ঠিক এরকম অবসন্নতায় ভুগেছিলাম খাজুরাহোর মন্দির দেখে। আবার আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দির দেখতে দেখতেও (ধাতৃষ(া ভুলে মন্দির চত্বরে বসে কাটালাম সেন্টু-চন্দন, অসীমা-অজিত-কৃষ(ার সঙ্গে। কণ্ঠ (দ্ধ হয়ে আসে। হৃদয় ভরে ওঠে। পিপাসার অবসান হয় কী এক বিমুগ্ধ শান্তিতে।

সেদিন হোটেলের মুক্ত(আকাশের নিচে গার্ডেন রেস্তোরায় আমরা সুভাষচন্দ্র ওঝাকে ডিনারে আপ্যায়িত করলাম। সুভাষজি হাম্পি গিয়ে উঠতে পারেনি। পরে একবার যাবে বলল। তাকে কাজের জন্য আরো দুদিন থাকতে হচ্ছে।

হসপেট থেকে এবার আমরা যাব বেলুড়-হলেবিদ। বিজয়নগর রাজত্ব ছেড়ে হোয়সাল রাজত্বে। মহাকালের হিসেবে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে। ভালো হত, যদি বেলুড়-হলেবিদ দেখে হাম্পি দেখা যেত। দ্বাদশ শতক থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে পৌঁছনো যেত।

হাসান হয়ে যেতে হবে। সকাল সাড়ে সাতটার বাস হসপেট থেকে আমাদের হাসান পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

চোখের উপর তখনো ভাসছে হাম্পির পাহাড়চূড়োয় পাথরের স্তূপ। হনুমানজি যেন সেতুবন্ধের জন্য রাশিরাশি পাথর ডাই করে রেখেছে। পাহাড়ের কোথাও (ক্ষ্ম ধূসরতা, কোথাও সবুজ কমনীয়তা। তার মধ্যে মূর্তি, মন্দির ও প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ। ভাস্কর্য ও ইতিহাসের স্মৃতি মেদুরতায় ভাসতে ভাসতে স্বপ্নের দেশে চলে গেলাম।

কে যেন কর্নাটকী খেয়ালে গাইছে — কৃষ(দেবরায় রাজা, কৃষ(দেবরায় রাজা।

চিত্র-১২৭। তুঙ্গভদ্রা, হাম্পি।